পঞ্চপ্রদীপ

পঞ্চপ্রদীপ

শেফালী দাস

পঞ্চপ্রদীপ
শেফালী দাস
প্রকাশকাল : জুলাই-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. আশরাফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০ (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৯৮-১-০
ISBN: 978-984-96898-1-0

Pancha Prodip By Sefali Das, Published by Chayyanir.
Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: July -2024; Copy Right:Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Ashraful Islam, Chayyanir Computer; Price: 300/- (Three Hundred Taka Only); ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উ ৎ স র্গ

জনদরদী কমরেড নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস
বৃটিশ ও পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের
দীর্ঘ কারা নির্যাতিত ও একাত্তরের মহান
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক

সূচি

ক্রমিক নং---পৃষ্ঠা

০১. শরতের ম্লান আকাশ---
০২. রাজাকার---
০৩. প্রেমানন্দে অবগাহন--
০৪. রঙের ডানা---
০৫. আত্মদান---

শরতের ম্লান আকাশ

বিকেল বেলায় ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে এসে বিশুদের বাড়ির পাশে মাঠে জড়ো হয়েছে বাবলু, লতি, বিশু, তাপস, আসমা, আনোয়ার, বাবু, কানু, গোপাল, সুমি, দীপু, জ্যোতি আরও কয়েকজন। খেলার বাট-বাটোয়ারা এবং কোন দলে খেলবে? কানু এসে বলল, কি খেলবে সেটা ঠিক না করেই বাট করবে? কীভাবে? গোপাল বলল, চল গোল্লাছুট খেলি, বাবু বলল, না না দাঁড়িয়াবান্দা খেলি। সুমি বলল, না-না এগুলো খেলবো না। দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করলে হাতে পায়ে ব্যথা লাগতে পারে এর চেয়ে আয় বৌ-জামাই খেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই খেলি, সবাই রাজী হলো, শুধু রাজী হলো না বিশু। বলল, আমি খেলবো না, কই আমার বউ কই? সেইতো আসেনি। আনোয়ার বলল, আসেনি আসবে। যা ডেকে নিয়ে আয়, বিশুর রাগ হলো, সবাই আসতে পারে আর রাজরানীর সময় হয় না। উনি আসতে পারে না, আমি গেলাম ডাকতে। বিশু ডাকতে দেবশ্রীর বাড়ির দিকে বকতে বকতে যাচ্ছে। গেটের সামনেই দেবীকে দেখা গেল এবং বলল, ঐ শাকচুন্নী তোর এখনও সময় হয়নি। সবাই মাঠে গেছে আর শাকচুন্নীকে ডেকে আনতে হয় বলে চুলের ঝুটি ধরে টেনে নিচ্ছে তখন দেবী চিৎকার দিয়ে বলল, ছাড় লাগছে কিন্তু। বিশু বলল, এবার ছেড়ে দিলাম, এরপর আর ছাড়বো না। দেবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বউ জামাই খেলবি, তুই আমার বউ হবি, বল বউ হবি? যখনই বিশু ঘুষি তুলেছে অমনি দেবী বলল, হব হব। বিশু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, দেখলি কেমন শক্ত মরদের দক্ষিণ দরজা। যখন আমি ঘুষি তুললাম তখন তুই রাজী হলি। চল চল বলে দেবীর হাত ধরে পুকুর পারে নিয়ে গেল। জেলা শহরে বাড়ি বিশ্বনাথের। বিশ্বনাথ ওরফে বিশু বললেই সবাই চিনে। কিন্তু এ কথা বললেই বিশু রেগে যায়। ছোট জেলা জগৎগঞ্জ। শুধু শহরের মাঝখানটুকু শহর। আর চতুর্দিকে গ্রাম্য আবহাওয়া ও গ্রাম্য পরিবেশ। বাসিন্দারাও গ্রামবাসীদের মত উদার। আবহাওয়াও গ্রামের মত। সারি সারি নানা প্রকারের গাছগাছালি। মাঝে মাঝেই দীঘি। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে কুমারী নদী। ছোট নদী কিন্তু বর্ষাকালে ভয়ংকর খরস্রোত। পুকুরপারে বড় একটা গাছ দেখে তার নিচে বিশু ও দেবী তাদের সংসার পাতলো। দেবী এসে বলল, এই বাজার করে নিয়ে আয়। বিশু ধমক দিয়ে বলল, একি রে বরকে তুই তুকারী করতে আছে?

– না থাকলো, আমি তোকে আপনি বলতে পারবো না।

– আপনে বলতে না পারিস তুমি বল।

– বাঃ বাঃ নিজে তুই করে বলছে, আমার বেলায় দোষ।

– দোষইতো। আগে সত্যিকারের বউ হয়ে নে তখন দেখবি বউ এর কি মজা।

– দেখ এত কথা বলবি না, আমি তোর বউ হবই না।

– হবি না, ন্যা, হবি না, শাকচুন্নি বলে আবার চুলের মুঠি ধরল।

দেবী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

দেবীর বয়স মাত্র ৬ বছর। আর বিশুর বয়স ১০ বছর। দু'জনের যেমন খাতির ঠিক তেমন ঝগড়াও হয়। শহরের মাঝখানে পৌরসভা। পৌরসভার সামনে দিয়ে ৩টা রাস্তা গিয়েছে। ঐ রাস্তাটাই শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম রাস্তা। পৌরসভার সামনের রাস্তার পাশেই একটা বিরাট বকুল ফুল গাছ। ঐ গাছের ফুলগুলোও বেশ বড় বড়। দেবীর খুব প্রিয় ফুল। প্রতিদিন সকালে বকুলফুল কুড়িয়ে নিয়ে লতা দিয়ে সুন্দর করে মালা গেঁথে কালীবাড়ী দিয়ে আসে। ঐ দিনও একটা মালা গাঁথা শেষ হয়েছে। গিরু দিচ্ছে এমন সময় বিশু কোথা থেকে দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে ওর হাতের মালা নিয়ে দে দৌড়। দেবী পিছনে পিছনে দৌড়ে গেল, ধরতে না পেরে রাগের চোটে বলল, কি বর বউ দেখে ভয়ে দৌড়ে পালালি কেন? দেখাচ্ছি মজা।

ঠিকমত কোন কিছু বুঝতে না পেরে দেবী ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। বিশুর বাবা সুরেন্দ্র ঘোষ তার চেম্বারে মক্কেল নিয়ে বসেছে। কোন ভূমিকা ছাড়াই দেবী চেম্বারে ঢুকে বলল, জ্যাঠাবাবু-

বিশুর বাবা বলল, কিরে দেবী, কিছু বলবি, এখন না যা পরে আসবি।

- না আমি এখনই বলব, নিজের ছেলে অন্যায় করেছে তো তাই বলতে দিচ্ছো না।

-ঠিক আছে বল, তাড়াতাড়ি বল, দেখছিস না আমার কাজ চলছে।

- শোন, আমি কত কষ্ট করে একটা বকুল ফুলের মালা গেঁথেছি, আর তোমার বদমাইশ ছেলে সেটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

দেবী কান্না জুড়ে দিল।

-ঐ কান্নার কিছু হয়নি, ও মালা তুই কারো না কারো গলেতো দিতিস, না হয় আমার বিশুর গলায় দিলি।

-না আমি ওকে দেব না, বলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে গেল। আর বলতে লাগল নিজের ছেলেতো তাই দোষ নেই।

পাশের বাড়িই দেবশ্রীদের। ওর বাবার নাম রমেশ মজুমদার। সেও পেশায় উকিল। সুরেন্দ্র ঘোষ ও রমেশ মজুমদার দু'জনে দু'জনের বন্ধু এবং দুজনেই উকিল। বাড়িও একখানেই। দেবী বিশুদের বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাবার চেম্বারে ঢুকেই জোরে জোরে কেঁদে উঠল। বাবাতো আদরের মেয়ের কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মেয়েকে কোলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে মা কি হয়েছে কাঁদছ কেন? মা বকেছে?

- না না বাবা, মা বকেনি। ঐ যে ঐ বাড়ির অসভ্য ছেলেটা বিশু, সে আমার গাঁথা মালা জোর করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

-ও ও এই কথা আমি ভেবেছি না জানি কি হয়েছে, ঠিক আছে তুমি মায়ের কাছে যাও, আমি দেখবো 'খন।

এক বাবা বললেন কোন দোষ হয়নি। আরেক বাবা বললেন দেখবো 'খন।

- আমি জানি বিশুতো ছেলে তাই ওর প্রতি তোমাদের ভালোবাসার অন্ত নেই, বেশ যা ইচ্ছে তাই কর।

ঘোষ পরিবার ও মজুমদার পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা। সুরেন ঘোষের তিন ছেলে ও এক মেয়ে আর মজুমদারের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ওদের ছেলে-মেয়েরাও খুব ভাল। খেলতে খেলতে একদিন ওদের বাল্যজীবন কেটে গেল। কৈশোরে ওরা পা দিয়েছে। দেবীতো লজ্জায় ঘোষ বাড়ি যায়ই না। ছোটবেলার বর খেলার স্মৃতি ওর মনে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিশুর সামনে যেতেই ওর কেমন অযাচিত লজ্জা এসে ওকে যেন পঙ্গু করে দেয়। ও বাড়ির দিকে লজ্জায় আর এগুতে পারে না। বিশু একদিন এসে বলল, দেবী তুই নাকি অনেকদিন হয় আমাদের বাড়ি যাস না, কেনরে? কি হয়েছে?

- কি আবার হবে? কিছুই হয়নি।

-তবে যাস না কেন? আগেতো আমাদের বাড়িতে পড়েই থাকতি।

-আগের দিন কি আছে, বড় হয়েছি না। পড়াশুনা-স্কুল আছে।

-আচ্ছা তুই তোর পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাক, আমি চললাম।

-যাসনে বিশু ওরে যাসনে। বলার সঙ্গে সঙ্গে বিশু ফিরে এসে বলল, আমাদের বাড়ি যাস মা যে তোকে কত ভালোবাসে তা জানিস?

- আর তুই?

-আমারটা পরে হবে। আগে মায়ের ভালোবাসার দাম দে তার কাছে প্রিয় হতে চেষ্টা কর, তারপর আমি তো আছি আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

-বিশু তুই সত্যি বলছিস।

-সত্যি বলছি।

এ সমস্ত কথা শুনে দেবীর দেহে যেন কেমন একটা নতুনভাবে শিহরণ খেলে গেল। এমনটা সে আগে কখনও বুঝেনি। একবার ভাবল এটা কি ভালোবাসার দোলা, এটাই কি প্রেমের পূর্বাভাস? দেখতে দেখতে খেলতে খেলতে ওরা দু'জনেই বড় হয়ে গেছে। এখন ওরা সবই বুঝতে পারে। দেবী এবার এস.এস.সি. পরীক্ষা দিবে আর বিশু বি.এ. পরীক্ষা দিবে। দুজনেই লেখাপড়ায় ভাল এবং মনোযোগীও।

দেবীর লজ্জা অনেকটা কমে আসছে। এখন প্রায়ই বিশুদের বাড়ি যাতায়াত করে। বিশুদের বাড়ি ঢুকতেই ডানপাশে ফুলের বাগান আর বাঁপাশে বিশুর বাবার চেম্বার। ফুল বাগানে মালি বাগান পরিচর্যা করে। ঢুকতেই গেট জুড়ে লতানো বেলীফুল গাছ। একটু দূরে জবা, করবী, গন্ধরাজ, টগর, কুন্দ, গোলাপ, দোলনচাঁপা আর একটু দূরে রজনীগন্ধা আরও নানা রকমের ফুল। ফুলবাগানের গন্ধওয়ালা ফুল তুলে জ্যাঠার শোবার ঘরের ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে দেবী। জ্যাঠা এসে বলে, আমার লক্ষীমা, তাইতো এত সুন্দর রুচি। ফুলের গন্ধে ঘর ম-ম করছে। জ্যাঠার মেয়েরা লেখাপড়া ও নিজেদের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর দেবী বউমাও জ্যাঠার দিকে দৃষ্টি রাখে। সংসারের কোন কাজটি করে দিলে বড়মার কষ্ট হবে না। তাই বড়মার হাতের কাজ করে দেয়। বড় মা দেবীর প্রতি মহাখুশী। হাতে ধরে বিভিন্ন ধরনের রান্না বড় মা দেবীকে শিখিয়ে দিত। কীভাবে সংসার করতে হবে, সবার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে সবাইকে মানিয়ে নেওয়া যায় সবকিছু শিখিয়ে দিত। সেবার ভীষণ শীত পড়েছে। বিশু ঢাকায়। দেবী মনে মনে ভাবল বিশুর জন্য সোয়েটার বানিয়ে রাখবে। যখন বিশু আসবে তখন ওকে সারপ্রাইজ দিবে। খুব যত্ন করে, হৃদয়ের সমস্তটুকু ভালোবাসা দিয়ে সুন্দর করে সোয়েটারটা বানিয়ে বড়মার কাছে রেখে দিল। কার জন্য বানিয়েছে সোয়েটারটা সেটা শুধু বড়মা জানে। বিশু কবে বাড়ি আসবে জানায়নি। শুধু বলেছে আসছি। একথা শুনে দেবী মনে মনে বলছে, ও তুমিও আমাকে সারপ্রাইজ দিবে! দেবীর মনে মনে কল্পনা তুমি আসবে, দেবীও প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেদিন রাত্রি ১২ টার ট্রেনে এসে বিশু পৌঁছেছে দেবী কিছু জানতে পারল না। পরদিন সকালে ফুল নিয়ে দেবী বিশুদের বাড়ি যেয়ে ঠাকুর ঘরে ফুল রেখে রান্না ঘরে ঢুকামাত্র বিশু দেবীকে খপ করে ধরে ফেলল, সারপ্রাইজ এখন কি। কেমন করে আমার বউর কাছে এসে পড়লাম। দেবী আস্তে করে ধমকের সুরে বলল, চুপ কর সবাই শুনে ফেলবে।

-শুনুক তাতে দোষ কি? আমি তো সত্যি কথা বলেছি। দেবী এক দৌড়ে বড়মার ঘরে গিয়ে তার বাক্স খুলে সোয়েটার বের করছে দেখে বিশু চিৎকার করে বলল, ওমা দেখ, তোমার বাক্স খুলছে, চাবি পেল কেমন করে তুমি ওকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলছ।

সোয়েটারটা হাতে নিয়ে দেবী বড়মার কাছে গেল। বিশু বলতে লাগল, দেখেছ মা কেমন মেয়ে। তুমি ওকে কিছু বলবে না। তাই তো এত সাহস পাচ্ছে? মা বলল, না ওকে কিচ্ছু বলবো না, তুই আয় আমার কাছে। এত শীত পড়েছে, তাও তো ভাল একটা শীতবস্ত্র কিনছিস না, দেবী যা তো পরিয়ে দে। দেবী মায়ের আদেশ পেয়ে সোয়েটার পরিয়ে দিল, চতুর্দিকে টেনেটুনে মা ছেলের গায়ে ফিট করিয়ে দিয়ে বলল, বাঃ কি সুন্দর লাগছে। ছেলে বলে উঠল, সুন্দর লাগবে না কেন? তোমার ছেলে কি কম সুন্দর। এটা যদি ঐ শাকচুন্নী পরত তা হলে একটুও মানাত না। বিশুকে সুন্দর লাগছে দেখে দেবী হেসে হেসে বলল, না লাগুক সুন্দর, তাই কি? মা বলল, আমার ছেলেটাও সুন্দর মেয়েও সুন্দর, দুজনেই সুন্দর। দাও দাও আরো আস্কারা দিয়ে বাড়িয়ে দাও, বলতে বলতে বাড়ির বাইরে চলে গেল বিশু। দেবী বুঝতে পেরেছে সোয়েটার পেয়ে বিশু খুব খুশি হয়েছে। মুখে যাই বলুক না কেন, ওর মনের কথা দেবী ঠিকই বুঝতে পারে।

দেবী স্থানীয় মহিলা কলেজে এইচ.এস.সি. পড়ছে। বাড়ি থেকে ক্লাস করে। দেবী লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী। মনোযোগী হলে কি হবে, মাঝে মাঝে যেন কেমন আনমনা থাকে। লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না। এই যে বিশুটা গেল হঠাৎ করে। হয়ত ছয় মাস নয় মাস পর মাকে একখানা চিঠি দিল। তাতেই দেবীর নাম লিখে জানতে চাইল দেবী কেমন আছে। আমাদের বাড়িতে আগের মত আসে কিনা, তোমার যত্ন করে কিনা? মা ডেকে বলে, ওলো দেবী শুনে যা বিশু চিঠি দিয়েছে, এ কথা শুনেই দেবী লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। মা আবার বলল, আয় দেখে যা। দেবী ধীরপায়ে মাথা নিচু করে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মা চিঠিটা নিয়ে বলল এইনে পড়, দেবী বড়মায়ের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বড়মার ঘরে চলে গেল,

চিঠিটা পড়ে দেবীর একটুও মন ভরেনি। যাই হোক। যেভাবেই হোক। মায়ের কাছেই হোক। তবুও তো দেবীর খোঁজ নিয়েছে আমার তাই মাথা সমান। ছোট বেলায় বলত, আগে তোকে বিয়ে করে নেই। তুই আমার খেলার বউ না হয়ে যেদিন সত্যিকার বউ হবি সেদিন দেখবি সত্যিকার বউ কাকে বলে, ভালোবাসা কাকে বলে, বউকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়। এসব কথা চিন্তা করতে করতে দেবী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। একটু হাত ধরে টান দিলেই দেবীর শরীর হৃদয় কেমন যেন কেঁপে উঠত, শিহরিত হতো। এর নামই কি প্রেম। তখন বুঝতে পারেনি কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই যেন দেবী বুঝতে শিখেছে। তাই বিশুর খুব কাছাকাছি যায় না। একদিন কথায় কথায় বিশু পিঠে হেলান দিয়ে কথা বলছিল। অমনি বিশু মা মা করে চিৎকার করে বলল, মা-ওমা দেখ দেবী আমার পিঠে হেলান দিয়ে কথা বলছে। দেবী লজ্জা পেয়ে ওখান থেকে সরে ঘরের ভিতর চলে গেল। মা রান্নাঘর থেকে বলে উঠল আমাকে কাজ করতে দে, বুড়ো ছেলে, এখনও মা মা করে।

একদিন দুজনে হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসল। দু'জনেরই মনে হচ্ছে এই পুকুরপারে তাদের কত স্মৃতি। সেটা কিছুতেই ভুলার নয়। বিশু বলেছিল, শাকচুন্নী তোকে যখন বিয়ে করব, তুই যখন আমার সত্যিকার বউ হবি, তখন সত্যি সত্যি তোকে কত ভালোবাসবো। সেটা বলে শেষ করা যাবে না। ভালোবাসায় ভালোবাসায় তোকে ভরিয়ে তুলব। তুই বুঝতেই পারবি না তোর বিশুর ভিতরে এত আদর এত ভালবাসা ছিল, সে এতটা ভালোবাসতে পারে। তুই বুঝতেই পারবি না যে এটা তোর বিশু। দেবী বলে উঠল, থাক এত ভালোবাসতে হবে না।

বেশি ভালোবাসলে আমি...

বিশু বলল, কিরে আমি..তুই কি বল না,

দেবী বলল, চল অন্যদিন বলব।

- না তোকে এখনই বলতে হবে।

- আজ চলতো বাড়ি যাই, আমার ভাল লাগছে না

-বুঝতে পেরেছি, আমাকে এড়িয়ে গেলিতো।

দেবী হাত বাড়িয়ে দিল, বিশু ওর হাত ধরে টিপতে টিপতে দলেমুচরে দিল। দেবী বলল, ছাড় ব্যথা পাচ্ছি তো। বুঝতে পারছিস না। আমি সত্যি সত্যি শাকচুন্নী নই, আমিতো মানুষ। হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারিনিরে। কিছু মনে করিস না।

দেবী বি.এ. পড়ছে আর বিশু এলএলবি পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যবস্থা করছে। বিশুর বাবা শহরের বড় উকিল। তার ইচ্ছা ছিল তার ছেলে ব্যারিস্টারি পড়ে নিজের দেশেই ব্যারিস্টার হোক। বিশুকে লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিদেশ যাবে, তাতে বিশুও খুব খুশি। শুধু খুশি নয় দেবী, দেবীর কিছুতেই ভাল লাগছে না। দেবীর মা দেবীর অবস্থা বুঝতে পারে। সে ভাবে এভাবে ছন্নছাড়া হয়ে থাকলে দেবীর মনটা মোটেই ভাল থাকবে না। এতো ঢাকা আর ময়মনসিংহ নয় যে ইচ্ছে করলেই ট্রেনে চেপে চলে আসতে পারবে। তাই দেবীর মায়ের ইচ্ছে বিশু বিলেত যাওয়ার আগে বিয়েটা হয়ে যাক। এ কথাটা সে গিয়ে বিশুর মাকে বলল, বিশুর মায়েরও তাই ইচ্ছা। দুই উকিল গিন্নির একই মত। ওদিক থেকে ছেলেটা গুমরে গুমরে মরবে। আর এদিক থেকে মেয়েটা। উকিল সুরেন ঘোষ ও রমেশ মজুমদার দুই জনেরই ইচ্ছে, ছেলে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসে বিয়ে করবে। বর এবং কনে তো মা বাবার অনুগত এ ব্যাপারে তাদের কোন মতামতই ব্যক্ত করে নাই এবং করবেও না। দুই গিন্নির খুবই ইচ্ছা ছিল বিয়ের পক্ষে। কর্তারা তাদের মতামতের দাম না দেওয়াতে তারা খুবই মনঃক্ষুন্ন। কি আর করবে, দুঃখ-কষ্ট সবকিছু মানিয়ে নিতেই হবে। পুরুষ শাসিত সমাজে যুগযুগ ধরে নারীরা নীরবে তাদের আনীত নিয়ম পালন করেই আসছে। এ আর নতুন কি তবুও দুই গিন্নি একত্র হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বলে অশ্রু ফেলে। যেহেতু করার কিছু নেই। কাজেই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।

যাবার কয়েকদিন আগে থেকেই বিশু যেন কেমন অক্টোপাসের মত দেবীকে আগলে রেখেছে। সর্বদা দেবীকে ডাকবে। সামান্য কাজেও দেবীকে চাই, যেমন- জামার বোতাম লাগিয়ে দেওয়া, ঘড়ি পরিয়ে দেওয়া। কাপড়-চোপড় কখন কোনটা পরবে পরিপাটি করে দেওয়া। এক মুহূর্তও দেবীকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। বিশুও যেন কেমন ধৈর্য হারা হয়ে গিয়েছে। দেবীকে বলে, দেখিস আমি চলে গেলে তোর কিছুতেই দিন কাটতে চাইবে না। আমি বুঝতে পারি তোর কষ্টটা। তবুও ভবিষ্যতের কথা ভেবে যাচ্ছি শোন দুঃখ করিস না। আমি প্রতি সপ্তাহে তোকে চিঠি দিবো ঠিকমত উত্তর দিস। দেখা না হলেও চিঠি আদান প্রদানেও তো মনের ভাব ও অন্তরের কথা জানা যাবে। তোর দিব্যি রইল। ঠিকমত চিঠির উত্তর না দিলে আমার লেখাপড়ায় মন বসবে না এবং সঞ্জীবনী সুধা না পেলে প্রাণও বাঁচবে না। তোকে শাকচুন্নী বলে বকা না দিলে আমার আত্মার শান্তি হবে না, যত তাড়াতাড়ি পারি পরীক্ষা শেষ হলেই চলে আসব, এত কথা শুনে দেবী অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে কোন কথারই উত্তর দিতে পারছে না। বিশু পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখ মুছে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতে থাকল, কোন সান্ত্বনা কি দেবী মানতে পারে। দেবীর ভালোবাসা অকৃত্রিম। ছোটবেলা থেকে যখন থেকে সে অবুঝ তখন থেকে জেনে আসছে বিশুর বউ সে। এতকালের জানা এতকালের বুঝা কি করে ভুলে থাকবে। দেবী কেঁদেই চলেছে। কথাবার্তার এক ফাঁকে দেবী উঠে গিয়ে মার কোলে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মা মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বিশুর লন্ডনে যাওয়ার দিন আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এসেছে। ওদের সঙ্গে মা-বাবাও যাবে ঢাকায় বিদায় জানাতে। দেবশ্রীকে সুরেন ঘোষ বারবার বলছে ওদের সঙ্গে যেতে কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বলছে, জ্যাঠাবাবু তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না। এ কথা শুনে কচি মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল। বলল, ঠিক আছে।

বিশু দেবীর পাশে এসে বলল, সত্যিই তুই যাবিনে, তুই এত নিষ্ঠুর আমি ভাবিনি শুধু ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে জানিস। কাঁদতে কাঁদতে দেবী বলল, আর বলিসনে,

আমি আর পারছি না। বিশুদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সবাই আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠল। জানালা দিয়ে বিশু তাকিয়েই আছে তার প্রিয়তমাকে দেখার জন্য। আর তার শাকচুন্নী তার অতি প্রিয় বিশুর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। এক চিৎকার দিয়ে দেবশ্রী বাড়ির ভিতর চলে গেল। রমেশবাবু স্ত্রীকে বলল, তুমি যাও মেয়েটার কাছে। ওর স্ত্রী বলল, কিচ্ছু হবে না, ওরটা ওকেই বুঝতে দাও। কাঁদতে দাও। কেঁদেকেটে হালকা হবে ওর দুঃখ, তারপর দেখ বে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে। রমেশবাবু খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে, মেয়েদের ব্যাপার তোমরা মেয়েরাই ভাল বুঝবে। আমার মেয়ে যেন ভাল থাকে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

দেবী সর্বদা ভাবে লেখাপড়া ভাল করে করতে হবে এবং ফল ভাল করতে হবে। ব্যারিস্টারের বউ হতে হলে তাকেও তো যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে, তাই সে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। সবাই খুব খুশি। বাবা চাইল মেয়েকে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াবে। সুরেন বাবুরও তাই ইচ্ছা। বিশুর পরীক্ষা শেষ হয়ে রেজাল্ট বের হয়েছে। বিশুর রেজাল্ট সন্তোষজনক হয়েছে এখন দেশে চলে আসার কথা। আজকাল বিশু বাড়িতে খুব কম চিঠি লিখে, তাতে বিশুর মা খুবই চিন্তিত। মজুমদার দিদির কাছে গিয়ে তার দুঃখের কথা বলে। দিদি, লোকে বলে ও দেশে গেলে মানুষ পর হয়ে যায়। ও দেশে নাকি একবার গেলে আর আসতে চায় না। এ কথা মনে হয়ে আমার মন কেমন করে উঠে। মজুমদার গিন্নি ধমক দিয়ে বলে, তোমার যত আকথা কু-কথা। যাও এখন বাড়ি যেয়ে খাওয়া দাওয়া করে লম্বা একটা ঘুম দাও। সব কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে। দুপুরে স্নান করে এলোচুলে দেবশ্রী ঠাকুর ঘরে ঢুকবে, এমন সময় পিয়ন এসে সুরেনের বাড়িতে হাঁক দিয়ে বলছে, চিঠি চিঠি। শুনেই দেবী চিঠিটা হাতে নিল। দেবী চিঠিটা নিয়ে বড়মার হাতে দিয়ে বলল, চিঠি আসে না, চিঠি আসে না এজন্য মহাচিন্তা। নাও এখন চিন্তা দূর হলো তো।

দেবী পূজা করতে করতে একটা কান্নার আওয়াজ পেল। থাকগে পূজাটা সেরে নেই। পূজা সেরে বের হতেই যেন শুনতে পেল ও বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। বড়মার কান্নার আওয়াজ শুনে ভিতরে ঢুকতেই বড়মা দেবীকে দেখে আরও জোরে চিৎকার দিয়ে বলল, দেবীরে আমার সর্বনাশ হয়েছে রে, তোরও সর্বনাশ হয়েছে। একথা শুনে দেবী হতবাক হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় মা বলল, কাছে আয় এই দেখ চিঠিটা পড়। খাম দেখেই দেবী বুঝতে পেরেছে ওটা বিশুর চিঠি, বিশুর একি হল? এটা ভেবে দেবীও অস্থির হয়ে পড়ল। চিঠি পড়ে সব অবগত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেল। বিকেলে উকিল বাবুদের আসার পর চিঠি নিয়ে আলোচনায় বসল। গিন্নি বলল, এমন ছেলে আমি পেটে ধরেছিলাম যে বেইমানী করবে। মজুমদার গিন্নি বলল, আমার লক্ষ্মীকে এমন করে কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? সুরেন বাবু বলল, এ বিয়ে দেখো কিছুতেই টিকবে না, ওরা আমাদের দেশে এসে সংসার করবে দু'দিন পরে তোমরা দেখো। রমেশ বাবুরও মন খুব খারাপ। সে বলল, যা খুশি তাই হোক। আমি আমার দেবীতুল্য মেয়েকে অতিসত্বর বিয়ে দেব। ওরা লন্ডন থেকে আসার আগেই আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিব। যাতে সে বিশু ও বিশুর বৌকে না দেখে। আমার মেয়েকে আমি আর কষ্ট দিতে চাই না। যা বলা তাই করা, বিভিন্ন লোকদ্বারা রমেশবাবু পাত্রের সন্ধান করতে লাগল। শেষে মদনপুর জেলায় এক বাপের এক সুপুত্র সৌমিত্র ভৌমিকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। সুরেন বাবু বলল, রমেশবাবু তুমিতো মেয়ের বিয়ে ঠিক করলে তা জিদ করেই হোক, আর রাগ করেই হোক, একবার কি আমার দেবীমার অনুমতি নিয়েছ?

-তুমি কি আমাকে এতই বোকা মনে কর? ছেলে সরকারি ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরী করে।

-মতামত নিয়েছ ঠিক? মা কী বলেছে? মত দিয়েছে?

- কি আর বলবে, বলেছে, বাবা তোমার মতই আমার মত।-কি?

দেবী ও সৌমিত্রের বিয়ে হয়ে মজুমদার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে তখন মদনপুরের দিকে বিশ্বনাথ ও তার নববিবাহিত স্ত্রী।

ইংরেজি মেয়ে ডায়নাকে নিয়ে বাড়ি আসছে। দুই গিন্নি গলা ধরে কাঁদছে। এদিকে একজোড়া দম্পতি বিয়ে করে বাড়ির দিকে হাট তলা দিয়ে বুড়া বটগাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর অন্য দিকে আর এক জোড়া দম্পতি এগিয়ে যাচ্ছে দেবীর সেই অতি পরিচিত পুরনো দিনের স্মৃতি বিজড়িত ঘাটলার পাড়ের রাস্তা দিয়ে। শেষ বিকেলের নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতিও যেন দেবীর মনের কথা বুঝতে পেরে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

রাজাকার

৭ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে দুপুরে অপার আনন্দ ও একবুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার স্বাধীন বাংলার মাটিতে এসে মা-মা বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভিতর ঢুকেই দেখি মা আমার দাওয়ায় বসে হাউমাউ করে চিৎকার করে কাঁদছে। আমাকে দেখে কোথায় আনন্দিত হয়ে আমাদের কাছে আসবে, তা না করে মা আমার আরও উচ্চস্বরে কাঁদছে। অবাক হলাম। একি! আমি কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ওমা তুমি কাঁদছ কেন? তুমি খুশি হওনি, তোমার ছেলেমেয়েরা ফিরে এসেছে। মায়ের চোখের জল মুছে দিয়ে ঘরের মেঝেতে নিয়ে মাকে বসালাম। মা কিছুই বলছে না, কান্নাও থামাচ্ছে না। আমাকে জড়িয়ে ধরে আবার চিৎকার দিয়ে উঠল, ওরে আমার কনারে। তুই কোথায় গেলিরে, তোর আদরের ভাইবোনেরা ফিরে এসেছে। ওদের দেখবি না? ওদের আদর যত্ন করবি না কতদূর থেকে কত পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে। ওদের যত্নআত্তি তুই না করলে কে করবে?

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম মেজদির কিছু একটা হয়েছে। তাই মায়ের আর্তনাদ থামানোর জন্য আমাদের শত কষ্ট হলেও আমাদের দুঃখ ও কষ্টকে চাপিয়ে রেখে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। বললাম- ওমা, ওঠ দেখ তোমার দুই ছেলে কল্যাণ ও বিমান এসেছে, ওদের কাছে টেনে নাও। সারাদিন কিছু খায়নি। এ কথা শুনে মা যেন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পেল। ছেলেদের দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমার মেজদি বড় ভাল মেয়ে। জীবনে কাউকে কোনদিন কটুকথা বলেনি, ঝগড়াও করেনি, খুবই শান্তশিষ্ট। মায়ের অতি প্রিয় কন্যা। মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রেখেছিল কনকপ্রভা। মেজদির সব করতে ভাল লাগত শুধু লেখাপড়া করতে ভাল লাগত না। মা-বাবা তাতে কিছু মনে করত না, কারণ তখনকার দিনে মেয়েরা এত লেখাপড়া করত না। সে রান্নাবান্নায় খুবই দক্ষ ছিল। তার হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, সে সহজে ভুলতে পারত না তার সুস্বাদু রান্নার কথা। অতিথি আপ্যায়ন, সেলাই ফোড়াই, সাংসারিক সমস্ত কাজে পারদর্শী ছিল আমার মেজদি।

মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে মেজদিকে বলত, আমি গন্ডগ্রামে থেকে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে পারিনি, তাই বলে কি আমি লেখাপড়া শিখিনি? তোদের বাবার প্রচেষ্টায় বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছি। এমন একটা লোকের মেয়ে হয়ে তুই লেখাপড়া করবি না, এ কেমন কথা। বাবা বলত, ওকে ওর মত থাকতে দাও। মায়ের চোখের মনি মেজদি শুধু প্রাইমারি পাশ করেছিল।

চিরদিনই ভোরবেলায় আমরা ঘুম থেকে উঠতাম। বাবা নিজেও উঠতেন আমাদেরও উঠিয়ে দিতেন। বাবা বলতেন, ভোরের হাওয়া লাগলে গায়, সকল অসুখ দূরে যায়। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে দেখতাম মেজদি আমাদের জন্য চা-মুড়ি, চা-বিস্কুট (লম্বা লম্বা বিস্কুট ও তাক্তা বিস্কুট পাওয়া যেত) এনে হাজির করত। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। ছোট ভাই বোনদের স্নান করানো, খাওয়ানো, কাপড়চোপড় ধোওয়া, স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুত করে দেওয়া। রান্নার কাজে মাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। এতগুলো ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাতে মায়ের কষ্ট না হয়, সংসারের সবদিকে তার খেয়াল ছিল। সে যেমন সবার জন্য ব্যস্ত তেমনি সবাই তাকে ভালোবাসত ও মান্য করত।

২৫ শে মার্চের রাজারবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা নানাভাবে জানতে পারি। অনেকেই প্রাণভয়ে ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে টাঙ্গাইল এসেছে তাদের কাছে পাক সেনাদের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। পাশের বাড়ির মাস্টার কাকা শহর ছেড়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হিঙ্গানগর নিজস্ব ট্রাক নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেজদি গিয়ে উনাদের বললেন, আমাদের তিনবোনকে আপনাদের সঙ্গে নিবেন? শুনে মাস্টার গিন্নি একটু আপত্তির সুরে বললেন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আমি কি করে অন্যলোক নিয়ে যাই, উনারা যদি কিছু মনে করে, তাছাড়া এই গন্ডগোল কতদিনে মিটবে কে জানে। আমি বললাম, না- না আমরা হিঙ্গানগর যাবো না, আমার বান্ধবীর বাড়ি যাবো, আপনাদের গাড়িতে নিবেন কি? মাস্টার গিন্নি বললেন, তা হলে চল, কিন্তু কোথায় যাবে? আমি বললাম, গমজানী যাবো।

প্রথম সিদ্ধান্তটাই আমাদের ভুল হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর আমি চাকরিতে যোগদান না করে যদি জামালপুর থেকে টাঙ্গাইল না এসে ওখানেই থাকতাম, তাহলে সেটাই সঠিক হতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সহজ হতো। সেদিন অনুর্বর মস্তিষ্কে এত বড় সত্য কথাটা ঢুকেনি যে দেশ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে। আমাদের সেরকম কোন শক্ত-সামর্থ্য অভিভাবক ছিল না। বড় ভাইরা এদেশে নেই, বাবাও বৃদ্ধ। এই অবস্থায় অভিভাবক মেজদি। তবুও সে তার সাধ্য অনুসারে আমাদের বাঁচাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

অন্যলোকের বাড়িতে কতদিন থাকা যায়। উপরন্তু তিনটি মেয়েলোক। ঐ দুর্যোগে যুবতীদের ভার কেউ নিতে চায় না, নিজেদেরও তো চক্ষুলজ্জা আছে। তাও নাকমুখ গুঁজে ১০ দিন থেকেছি বাড়ির লোকেরা মুখে কিছু না বললেও খুসখুসানি ভাব করে কিছুটা আপত্তি বুঝিয়েছে। এদিকে পাক বাহিনী টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালাচ্ছে, জ্বালাও পোড়াও ধরে নিয়ে যাওয়া, হত্যা করা ইত্যাদি। এটা জানা সত্ত্বেও আমরা তিনবোন পায়ে হেঁটে গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে। আমি কোনদিন ঐ সমস্ত রাস্তায় যাইনি। পথে দু একজন লোকের সাথে দেখা হলেই প্রশ্ন করত। তোমরা কারা, কোথা থেকে এলে? কোথায় যাবে? তোমাদের সঙ্গে কেউ নেই? কখনও উত্তর দিতাম, কখনও পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতাম। রাস্তায় নেমে বুঝতে পারলাম আমরা কতখানি অসহায়। আমরা পায়ে হেঁটে কৈজুরী, তারটিয়া, আউলটিয়া হয়ে ঘারিন্দায় এসে পৌঁছাই। আমাদের দেখে মা খুশি না হয়ে মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। আমাদের কোথায় রাখবেন, কি করবে এ ভাবনায় মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বাবা টাঙ্গাইলের বাসায় থাকতেন আর মা আমাদের নিয়ে ঘারিন্দার বাড়িতে মহাদুশ্চিন্তায় দিন কাটাতেন। ১৪ই এপ্রিল আগুনের কুণ্ডলী দেখা গেল পরে

জানতে পারলাম টাঙ্গাইল সাবালিয়া হিন্দু বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়েছে পাকবাহিনী। এ ঘটনায় মা আরও চিন্তায় পড়লেন।
এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন ভোরবেলায় মা আমাদের ডেকে বললেন, ঐ তোরা তাড়াতাড়ি ওঠরে, সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রাম পাকবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। যে যেখানে পারিস, তাড়াতাড়ি পালা। আমরাও পালাতে চেষ্টা করছি, আর যেদিক থেকেই বাড়ি থেকে বের হতে যাই, সেখানেই পাক সেনারা দাঁড়িয়ে আছে। বাধ্য হয়ে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলাম, ৮০ বছর বয়সের বৃদ্ধ আমার জ্যাঠামহাশয় এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ভোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, বাড়ির পিছন দিক ফাঁকা, ওখানে পাক সেনাদের কেউ নেই। দৌড়ে তাড়াতাড়ি পালা। আমিও খানিক কালবিলম্ব না করে বাড়ির পিছনে ঝোঁপের মধ্যে পালালাম। ক্ষণিক পরে দেখি পাকসেনারা চলে গেছে। ওখান থেকে বের হয়ে বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামহাশয় ধমক দিয়ে বললেন, এখনও তোরা যাসনি? তখন মেজদি আমার এক ভাতিজি অঞ্জলীর হাত ধরে এবং আমাকে ও আমার ছোটবোন সোনালীকে নিয়ে বাড়ি থেকে এমন দৌড় দিলো আমরা এক দৌড়ে আগ বেথুর গিয়ে পৌঁছালাম, পিছনে তাকানোর কোন অবকাশ ছিল না। বেথুর গোসাইবাড়িতে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাড়ির একলোক আমাকে চলে যেতে বলে এতজোরে ধাক্কা দিলো যে আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। মেজদি তো ভয়ানক ক্ষুব্ধ হলো কিন্তু কি করবো, আমরা যে এখন নিরুপায়।
এবার আমাদের তিনজনকে নিয়ে মেজদি বিপদে পড়ল। গ্রীষ্মের খরতাপ কিছুই আমাদের কাবু করতে পারে নাই। অমিততেজে আমরা ৪ জন গ্রামের পর গ্রাম ছুটে চলছি। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। মেজদি বলল, এদিকে যখন এসেই পড়েছি, চল আমরা বড়ভাইঝির বাড়ি ধলাপাড়া যাই। আমি বললাম, মেজদি আমরা তো রাস্তা চিনিনা, কি করে যাবো? এবার এ বিপদে দিদি ধৈর্য হারা হলো না, বলল,- চল ঈশ্বর কপালে যা রেখেছে তাই হবে। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবো। মেজদি আমাদের সাহস ও ভরসা দিতে লাগল।
আমরা দুপুরের পরপর ধলাপাড়া এসে পৌঁছলাম। ওরা আগেই ঘারিন্দার ঘটনা জানতে পেরেছিল। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ভাইঝি জামাই, বিয়াই বাড়ির সবাই আমাদের ঘিরে ধরল। নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমার বিয়াই মহাশয় বললেন, এখন এসব থাক, রাতে শোনা যাবে, এদের মুখ দেখে বুঝতে পারছ না কত ক্লান্ত। এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা তো ঘারিন্দার পরবর্তী সংবাদ শোনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। সন্ধ্যার দিকে গ্রামের কোন একজন এসে জানালো সরকার বাড়ি ও বাকালী বাড়িতে পাকসেনারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের বাড়ির কাউকে হত্যা করা হয়নি। শুনে আমি তো কান্না আরম্ভ করলাম। যাদের বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করছি, এই অবস্থায় কি করে তা সম্ভব। মেজদি ভয়ঙ্কর ধৈর্যশীল, আমাদের কাঁদতে দেয়নি বুকের কাছে নিয়ে জাপটে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল, তোর না কত সাহস ও ধৈর্য আছে। এখন এমন করছিস কেন? আমার বোনেরা তো অবুঝ নয়।
ধলাপাড়া দু তিনদিন থাকার পর জানতে পারলাম, দু' এক দিনের মধ্যে এখানে মিলিটারি আসবে। ওরা কিছু বলেনি বরং থাকতেই বলেছে সবাই, দত্তবাড়ির ভদ্রতাই আলাদা। আমরা ভাবলাম বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে না থাকাই ভাল। আমরা ৪টি মেয়ে ওখান থেকে আবার পায়ে হেঁটে মেজদির নেতৃত্বে চাকলান এলাম। চাকলান গ্রামটি কালিহাতি থানার একটি গ্রাম। ওখানে থাকে আমার জ্যাঠাত বোন দীপ্তিদে, তরুণ কুমার দেব (ভানু) এর স্ত্রী। সময়টা খুব লম্বা লাগছিল কেমন করে দিনের পর দিন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকব।
ঘারিন্দা ফিরে যাবো। জুন মাসের দিকে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম কিন্তু এখানে এসেও কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। ছোট ভাইদের কি করে নিরাপদে রাখা যায় সে চিন্তায় আমরা সর্বদা অস্থির থাকি। কয়দিন বাড়িতে থেকে রাজাকারদের দৌরাত্ম্য দেখে মরে যেতে ইচ্ছে করত। যারা আমাদের দেখে একদিন শ্রদ্ধায় নত হ'তো নম্রভাবে কথা বলত আজ তারা আমাদের প্রতিপক্ষ মনে করে, বাড়িতে কয়দিন থেকে ঠিক করলাম, ভাইবোনসহ আমরা আমার কর্মস্থল জামালপুর যাবো। আমরা চারজন ও ছোটভাই দুইজন এক সঙ্গে রওনা দেব। মেজদি রাজী হলো না, বলল, মা-বাবাকে দেখবে কে? তুই ওদের নিয়ে যা, না হলে একাই যা।
একা একা কীভাবে যাবো? - তা সম্ভব নয়, গ্রীষ্মকাল। ভ্যাপসা গরম। গ্রামের বাড়িতে ফ্যান নেই, লাইট নেই, কি কষ্ট। তবুও সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বেঁচে আছি এটাই আমাদের শান্তি। ভাইবোন, ভাতিজা-ভাতিজি কাকা জ্যাঠা মা, জ্যেঠী, কাকী সবাইকে নিয়ে একত্র আছি। খেলাধূলা, গল্পকরা বইপড়া এগুলো নিয়ে আমরা হইচই করে দিন কাটিয়ে দেই কিন্তু মনটা সর্বদা আতঙ্কে থাকে। এই বুঝি রাজাকার এলো, মিলিটারি এলো। মেজদি মাঝে মাঝে চিড়ে ভাজা, মুড়ি ভাজা, পাপড় ভাজা, কাঁচা আমের ভর্তা ও মোরব্বা এনে আমাদের আসরে দিত। ছেলেপেলেরা খুব খুশি হতো।
মা অতি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে। এটা মায়ের দোষ না গুণ তা জানিনা, কিন্তু এর জন্য তাকে মাঝেমাঝে খেসারত দিতে হয়েছে, হাসান নামের এক লোক আমাদের বাড়িতে ও টাঙ্গাইলের বাসায় কামলার কাজ করত। সে মাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসতো। মাও ওকে খুবই পছন্দ করত। ও বিশ্বাস করত। এমনকি বাড়ি ছেড়ে মা কোথাও গেলে হাসানকে পাহারায় রাখত। মায়ের দৃষ্টিতে সে খুবই ভাল, হাসান মাকে মা-ঠাকরুন বলে ডাকত। নারীরা মা ডাক শুনলে দুর্বল হয়ে পড়ে, এটাতো সত্যি কথা। অবশ্য জন্ম থেকেই নারীরা মা হয়ে জন্মায়। মায়ের ব্যবহার দেখে মনে হ'তো উনি যেন সত্যিকারের হাসানের মা।
হাসানের বাড়ি আমাদের বাড়ির পূর্বপাশ দিয়ে যে খাল বয়ে গেছে সেই খালের পূর্ব পাশে। ওরা নিতান্তই গরীব কিন্তু চাল-চরিত্র খুবই ভাল। এই দুর্যোগের মধ্যে মাকে

এসে দেখে যায়, আমাদের খবরাখবর রাখে। বাড়ির সামনে বড় করে সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়েছে "রাজাকার হাসান আলী খান"।
এখন হাসান রাজাকারের পোষাক পরে, হাতে রিভলভার, পায়ে বুটজুতা। মাথায় টুপি। রাজাকার বেশে যখন সে হাঁটে তখন তার চাল-চলন, হাবভাবের, কথাবার্তার অনেক পরিবর্তন দেখা যায়।
মা একদিন হাসানকে ডেকে বলল, তুমি থাকতে আমার এতবড় সর্বনাশ কেমন করে হলো? তুমি না রাজাকার। তুমি না আমাকে মা বলে ডেকেছ? তাই আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব তো তোমারই। হাসান মায়ের কথায় লজ্জা পেয়ে বলল, মা, বাড়ি পোড়ার ব্যাপারটা আমি ঘূণাক্ষরেও জানতাম না। আপনার ছেলে নিমকহারাম নয়। সে অনেক কথা আমি আপনাকে পরে বলব কিন্তু ভাইবোনদের বেলায় কথা দিতে পারি ওদের আমি কিচ্ছু হতে দিবো না।
অন্যের বাড়িতে আর কতদিন থাকা যায়। আমরা চাকলান থেকে ঘারিন্দা চলে এলাম, এসে দেখি মা পোড়া টিন পোড়া খাম জোড়া দিয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজার জন্য ছাপড়া তুলেছে। এটাও খেয়াল করলাম রাজাকারের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। তাদের আচরণ হিংসাত্মক। মা ভাবছে কি করে আমাদের রক্ষা করবে এই দুষ্ট প্রকৃতির রাজাকারদের হাত থেকে। ইদানিং রাজাকাররা ঘনঘন বাড়িতে আসে আর দিদি বলে ডাকতে থাকে। ওদের হাবভাব দেখে মায়ের একটুও ভাল লাগে না, কেমন যেন সন্দেহ হয়। মা মেয়েদের শহরেও পাঠাতে পারছে না, আবার গ্রামেও রাখতে পারছে না, উভয় সংকটে পড়েছে।
আমি তো জামালপুর যাবো কারণ টাকা পয়সার খুবই প্রয়োজন ওখানে আমার টাকা জমা আছে। তাছাড়া বেতনও তোলা হয়নি, মেজদি মা-বাবাকে ছেড়ে যাবে না। ছোট বোনটাও মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাই ঠিক করলাম আমার দুইভাইকে সঙ্গে নিয়ে জামালপুর যাবো। ওখান থেকে টাকা তুলে আমরা কামালপুর হয়ে মেঘালয়ে যাবো।
গ্রামের বৌঝিরা আমাদের বাড়ি এসে মাকে সাবধান করে দেয়, মেয়েদের আগলে রেখো, মেজদির উপর রাজাকারদের নজর পড়েছে। মা হাসানকে ডেকে এনে বলল, তোমার দিদিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার উপর আমি দিলাম, দেখ কি করবে?
হাসান এ কথা শুনে ও গ্রামের পরিস্থিতি বুঝে মাকে বলল, মা ঠাকরুন আমিও খুব চিন্তায় আছি। বোনদের কিছু হলে আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আচ্ছা মা, আমি যদি মেজদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেই, তাহলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না, মেজদিও রক্ষা পাবে। মা আৎকে উঠল। একি কথা! সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানে? হাসানও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, মা আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। মেজদিকে রক্ষা করার জন্য আমাকে যেভাবে যা করা দরকার, আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি তাই করব। মেজদির জীবনটাই দুঃখের। মা তার সইয়ের ছেলের সঙ্গে খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিল। সইয়ের নাম দুর্গারাণী গুহ। দুই সইতে এতভাব ছিল যে কেউ কারও কথা ফেলতে পারেনি। দুর্গা সই বলত ছেলেমেয়ে দিয়ে বিয়ে করিয়ে আমরাও অটুট বন্ধনে বাধা পড়লাম, মেজদির তখন বয়স ১০ এবং বর অপূর্ব গুহের বয়স ১৫ বছর। মা সই এর কথা রাখতে গিয়ে মেজদিকে বিয়ে দিলেও বরের বাড়ি থাকতে দেয়নি। বিয়ের আগেই সইয়ের সঙ্গে এই শর্ত ছিল যে মেয়ে সাবালিকা হওয়ার পর আর একবার ঘটা করে অনুষ্ঠান করে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে। তবে মেজদির শাশুড়ী নিজে বেড়াতে আসত এবং বৌকেও এবেলা নিয়ে ওবেলা দিয়ে যেত। শাশুড়ীর সঙ্গে একবেলা থেকে সংসারের কাজ করত শাশুড়ীর যত্ন করত। এতে শ্বশুরবাড়ির সবাই সন্তুষ্ট। কিন্তু একজন শুধু অসন্তুষ্ট। যাকে নিয়ে আত্মীয়তা, যাকে নিয়ে ঘর সংসার সেই বর অপূর্বগুহ অশিক্ষিত বৌ-এর সঙ্গে ঘর করতে চাইল না। মা বাবার শত অনুরোধ। নানাভাবে বুঝানো সত্ত্বেও অপূর্ব কিছুতেই রাজী হলো না, এ নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট অশান্তি শুরু হলো। অপূর্ব এতকিছুর সম্মুখীন হতে চাইলো না। বিয়ের ছয়বছর পর ওদের নূতন করে অনুষ্ঠান করে ফুলশয্যা করবে বলে সবকিছুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আত্মীয় স্বজনও কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় অনুষ্ঠানের দিন ভোরবেলা থেকে অপূর্বকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অপূর্বের বাবা ছেলের জন্য চিন্তা করছে না, কারণ সে পুরুষ মানুষ বি.এ. পাশ করেছে কিছু না কিছু সংস্থান সে করতে পারবে। তার যত চিন্তা ঐ একরত্তি মেয়ে কণক প্রভার জন্য। মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্বামী ছাড়া হলো। ওর জীবনটা কাটবে কীভাবে? দুর্গা ও দুর্গার স্বামী দু'জনেই নিজেদের দায়ী করছে- আমাদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আজ লক্ষ্মী প্রতিমাকে আমরা এমনভাবে হারালাম।
জামাই নিরুদ্দেশ হয়েছে এ কথা মা জানতে পেরে পাগলপ্রায়, মা নিজেও সর্বদা নিজেকে দোষারোপ করছে-মেয়ে আমার কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। এরপর থেকে মা মেজদির উপর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মেজদির সুখ কীসে, মেজদির ব্যথা কীসে এসব দিকেই মায়ের খুব খেয়াল ছিল। তেমনি মেজদিও সেবা-যত্নে সর্বদা মা-বাবাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত। যত দুঃখ থাক না কেন সেটাকে প্রাধান্য না দিয়ে অশান্তি না বাড়িয়ে স্বাভাবিক জীবনে তারা সবাই ফিরে আসতে চেষ্টা করে। বড়দি একদিন বৃষ্টিস্নাত বিকেলে কলেজ থেকে ফিরছিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বড়দিকে ডেকে কথা বললেন, বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলেন। বড়দি ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এতকিছু জানতে চাইছেন কেন? আপনি কি আমার বাবাকে চিনেন? ভদ্রলোকটি একটু হেসে বলল, এখন চিনিনা কিন্তু পরে চিনব। বড়দি বলল, কি করে? ভদ্রলোক বললেন, তখন দেখো, সব বুঝতে পারবে।
এ ঘটনার কয়েকদিন পর বড়দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির ছেলের সঙ্গে। খুব ধুমধাম করে বড়দির বিয়ে হয়ে গেল। কোন এক গোধূলি লগ্নে বড়দি একহাত ঘোমটা টেনে বধূবেশে লজ্জা নম্র মুখে বরের হাত ধরে ঘাটাইল শ্বশুর বাড়ি এসে পৌঁছাল।

এদিকে মায়ের সই দুর্গা পরিবারসহ পাকিস্তান ছেড়ে তারা ভারতে চলে গেছে, মা তাতে আরও দুঃখ পেয়েছে, আমাকে না বলে সই দেশ ছেড়ে একেবারে চলে গেল। আমাকে জানানোরও প্রয়োজন মনে করল না। আমি কাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছিলাম।
রাজাকার হাসান আলী খানের ইদানিং খুব ঠাট-বাট বেড়েছে। কতদিন আধপেটা খেয়ে দিন কাটিয়েছে সে কথা গ্রামের সবাই জানে। রাজাকারের বদৌলতে ওর ছেলে-মেয়েরা ভাল ভাল জামা-কাপড় পরছে, ভাল ভাল খাচ্ছে। গ্রামের লোকেরা রাজাকারকে খাতির করে, সম্মান দেয়, সালাম জানায়। এতো পেয়ে নব্যধনী রাজাকারটি ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এত ব্যস্ততার মাঝেও রাজাকার হাসান আলী আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত আর মাকে অভয় দিত। আস্তে আস্তে গ্রামে রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যেতে লাগল। অন্য রাজাকাররা আমাদের বাড়ি এসে মাকে নানা রকম ভয় দেখাত। তখন মা ভয় পেয়ে বাধ্য হয়ে হাসানকে ডেকে বলল, তোমার দিদির কি ব্যবস্থা করবে, তাড়াতাড়ি কর, আমি হয়তো আর ওকে বাঁচাতে পারবো না। হাসান মাকে বলল, মা ঠাকরুন আপনি যদি আমাকে অভয় দেন, তাহলে বলতে পারি এখন এমন একটা সময় এসেছে যেখানে হাসানকে ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। মা কাতরকণ্ঠে বলল, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি। যা বলবে চিন্তা ভাবনা করে বলবে তাতে যেন আমাদের মঙ্গল হয়।
হাসানও ঠিক করে ফেলেছে সে কি করবে। হাসান বলল, মা আপনি আমাকে ভরসা ও বিশ্বাস করবেন। আমি দিদির অমর্যাদা ও অসম্মান হতে দেব না। দিদিকে রক্ষা করতে যতখানি যা করা তা করতে কখনও পিছপা হবো না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে দিদিকে আমার হাতে দিয়ে দিন। মা অগত্যা নিরুপায় হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অপরিসীম বিশ্বাসে মেয়েকে রাজাকারের হাতে তুলে দিলেন। মা মেয়েকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে হাসানের বাড়ি যেতেন। তাতে হাসান খুবই রাগ করত। মেজদি ছাড়াও আরও অনেক মেয়েকে রাজাকারের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ওদের ধরে নিয়ে এসেছে। শক্ত গেট লাগানো হয়েছে, সবাইকে হাসান রাজাকারের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয় না। খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে মেয়েদের আটকে রাখা হয়েছে।
অনেক রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে শান্তির নিঃশ্বাস নিব, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। এটাই তো বাঙালির আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার। স্বাধীন বাংলাদেশে শরণার্থীরা আস্তে আস্তে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে অনেকেই তার স্বজনকে হারিয়েছে। অনেকে আবার তার প্রিয়জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মা তার আদরের কন্যাকে খুঁজে না পেয়ে রাজাকার হাসানের বংশের মুণ্ডুপাত করে চরম অভিশাপ দিচ্ছে। এজন্যই কি মেয়েটাকে দিদি বলে নিয়ে গিয়ে তার চরম সর্বনাশ করলি, তোর ভাল হবে না, ভাল হবে না, দেখিস! স্বাধীন হওয়ার দু'দিন আগে থেকেই রাজাকার হাসানের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আজও ওর বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

স্বাধীনতার ৫ বছর পর বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলার মানুষের, বাংলার রাজনীতির, বাংলার শাসকদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি জামালপুর থেকে টাঙ্গাইল বদলী হয়ে এসেছি। ভাইরা কলেজে পড়ছে। এত পরিবর্তনের মধ্যে একদিন কল্যাণের এক বন্ধু মনা পাল আমাদের কাছে এসে বলল, দিদি, দেখতো তোমাদের গেটের সামনে দু'টো বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মহিলা কাঁদছে। আমি বললাম, ও রকম অনেক ভিক্ষুক এসে এরকম করে। খানিক পরে 'ও' একাই চলে যাবে।
মনা বলল, নাগো, তা নয়, এটা একভদ্রমহিলা। কিন্তু ঘোমটায় মুখ ঢাকা বলে কিছু দেখতে পাই নি। চল না দিদি দেখবে, একরকম জোর করেই আমাকে গেটের সামনে নিয়ে গেল। আমি মহিলার কাছাকাছি গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, এই কি চাও, কিন্তু মহিলা নিশ্চুপ। আবার বললাম, না বললে বুঝব কি করে? সোনালী এলো মা এলো কল্যাণ এসে বলল, কিছু না বললে আমরা কি করে বুঝব তুমি কে? ঘোমটা খোল আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না। কাছে গিয়ে ঘোমটা খুলে দিলাম। সবাই অবাক বিস্ময়ে ৫ বছর পর দুই ছেলেসহ মেজদিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। মেজদি ওমা, ওমা বলে চিৎকার করে উঠল। মা এগিয়ে এসে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে জড়িয়েও আনন্দ ধরে রাখতে পারলো না। একটু পরে দেখা গেল অপূর্ব বাবুও দিদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বললাম, আপনি?
- হু--হু আমিই তো! এত সুন্দর একটা মুহূর্ত, এমন একটি আনন্দঘন পরিবেশ জীবনে ফিরে আসবে কি? তাই এই সুন্দর মুহূর্তের আমিও অংশীদার হলাম। আমি রাগত কণ্ঠে বললাম, সমস্ত কিছুর জন্য আপনিই দায়ী। আপনার জন্যই আজ আমাদের এত কষ্ট। যাক এখানে দাঁড়িয়ে কথা না বলে চলুন সবাই ভিতরে যাই। সব শুনব। রাত্রিতে খাওয়ার পর অপূর্ব সমস্ত ঘটনা বাড়ির সবার কাছে বলল।
আমার জামাই বাবু যে এত মজার মানুষ, এত সুন্দর করে ঘটনা বলতে পারে তা না শুনলে বিশ্বাসই করতাম না। আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে খাটে বসে তার কাহিনি শুরু করল। অপূর্ব গুহ মা-বাবার উপর রাগ করে অশিক্ষিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করল। ফুলশয্যার আগের রাত্রিতে বাড়ির সবার অগোচরে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়েছিল। ওখানে পৌঁছেই তো আর চাকরি পাওয়া যাবে না। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে ভারত পাকিস্তানে লেখাপড়ার কোন পার্থক্য ছিল না এবং নাগরিকত্ব নিয়েও কোন বিতর্ক ছিল না।
ওখানে গিয়ে অপূর্ব দেখে সেনাবাহিনীতে লোক নিচ্ছে। যথাযথ ব্যবস্থা করে চাকরিতে দরখাস্ত দিয়ে এবং মামাদের ঠিকানা দিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করে মাদ্রাজে চাকরিতে যোগদান করে। তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ থেকেছে। মা-বাবা ভারতে যাওয়ার পর তাদের কাছে ছুটি ছাটায় যেত। ইতোমধ্যে বাংলায় স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলো। মিত্রবাহিনী হিসাবে ভারত পূর্ণ সমর্থন দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাদের পাঠানো হলো তার মধ্যে অপূর্বর নাম লিস্ট হয়ে গেল। ছত্রি সেনাদের সঙ্গে অপূর্বও ঘারিন্দায় প্যারাসুট যোগে

অবতরণ করল। তারপরে শহরে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করল। সোলায়মান নামে ঘারিন্দার এক মুক্তিযোদ্ধা এক লোককে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওর নাম হাসান আলী খান, ওর কাছ থেকেই ঘারিন্দার সমস্ত খবর পাবেন। আর্মির পোষাক পরিত্যাগ করে অপূর্ব হাসানের বাড়ি গেল। ইন্ডিয়ান জওয়ান দেখে হাসান আলী অপূর্বকে সম্মান দিল। অপূর্ব নিজের পরিচয় হাসানের কাছে সব ভেঙ্গে বলাতে হাসান খুব খুশি হল। যখন শুনল সে সরকার বাড়ির জামাই, তখন হাসান আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হাসানের প্রিয় কনকপ্রভা দিদিকে প্রস্তুত করিয়ে তখনই জামাইবাবুর হাতে দিলো। এবার কনকপ্রভাকে তার বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে অপূর্ব হাসানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো কারণ মুক্তিযোদ্ধারা হাসানের প্রচুর প্রশংসা করেছিল। হাসান নিজের জীবন তুচ্ছ করে রাজাকার সেজে মুক্তিযোদ্ধাদের নানা খবরাখবর দিত এবং বিশেষ করে গ্রামের হিন্দুদের পক্ষে থাকত। সর্বদা চেষ্টা করত গ্রামের লোকদের সাহায্য করতে, হাসানের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। হাসান কোথায় গিয়েছে কেন দেশ ছেড়েছে তা কেউ জানে না।

অপূর্ব মনে মনে ভাবল ভাল মানুষের কোথাও ঠাঁই নেই! মানুষের মঙ্গলের জন্য মুখোশের অন্তরালে এতবড় একটা সুন্দর মনের যে মানুষ বাস করত, সেই মানুষটাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান জানাই। লাখো শহিদের সঙ্গে তোমাকেও সালাম-হাসান আলী খান।

প্রেমানন্দে অবগাহন

পারুলের মা ও পারুলের মা ডাকতে ডাকতে কলিমউদ্দিন বাড়ির ভিতর ঢুকছে। ডাক শুনে পারুলের মা ঘোমটা টানতে টানতে বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, কি? রাস্তা থিকা না ডাইকা একেবারে বাজার থিকা ডাকলেই পার, তাতে সারা গেরামের লোক শুনবো। তাই না? কলিমউদ্দিন হেসে দিয়ে বলল, আমি তুমারে ডাকুম না তো কারে ডাকুম। তুমিইতো আমার সব। তোমারে ডাকতে ডাকতে যাই আবার তোমারেই ডাকতে ডাকতে আসুম। ঠিক এমনি একদিন তুমারে ডাকতে ডাকতে পরপারে যামু। মুখ ঝামটা দিয়ে পারুলের মা বলল, দেখ, তুমারে এমুন কথা কইতে না করছি না। আবার যদি তুমি এই বাজে কথা কও তবে আমি আমার বাপের বাড়ি যামুগা, আর কোনদিনও আসুম না। সান্ত্বনার সুরে পারুলের বাবা বলল, নাগো না আর কমু না। চল ভিতরে যাই। বিয়ের পর কলিম উদ্দিন তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি নিজে নিয়ে গেছে আবার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, কোনদিনও একলা ছেড়ে বাপের বাড়ি রেখে আসেনি। একটা দিনও পারুলের মাকে ছাড়া কাটায়নি। এমন কথাতে কলিমুদ্দিন ভীষণ ব্যথা পায়। স্ত্রীকে সে অত্যাধিক ভালোবাসে।

তাই তার পিঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভিতরে দু' জনে চলে গেল, ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম বকুলতলা। ছোট হলে কি হবে। গ্রামটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, তাছাড়া গ্রামবাসী অধিকাংশই প্রগতিশীল, হিন্দু মুসলমান সবাই মিলেমিশে থাকে। বিভিন্ন পার্বণে ও অনুষ্ঠানে সবাই এক সঙ্গে আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করে। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে গেছে। তাছাড়া একটি খাল গ্রামের ভিতর দিয়ে ও একটি বিল গ্রামের এককোণে পড়ে আছে এবং পুকুরে মাছও চাষ করে থাকে। মোটামুটি সচ্ছল গ্রাম। মনে হয় গ্রামটিকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে। কলিমুদ্দীন ও ছলিমুদ্দীন দুই ভাই। তারা একান্নে প্রতিপালিত ওদের বাড়িটি বেশ বড়। তিন মহলা বাড়ি। বাহির বাড়ি তার সামনে বড় মাঠ, তারও সামনে আরও একটা বড় মাঠ, মাঠ ঠিক নয় গ্রামের লোকেরা তাকে পালান বলে, ঐ পালানে ধান মাড়াই করা হয়। বাহির বাড়ির সামনে উঠানের মত অঞ্চল তারপর বড় আকারের বাংলো ঘর, তারপর আর এক মহলে, যেখানে চাকর-বাকর কামলাদের থাকার ঘর ও অন্যান্য কাজ হয়ে থাকে। তারপর কর্তাদের থাকার ঘর, রান্নার ঘর, গোসল ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। কলিমউদ্দিনের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে রহিম।

ছোট ছেলে করিম, বড় মেয়ে পারুল বেগম ও ছোট মেয়ে মুকুল বেগম। ছলিমউদ্দিনের এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ের নাম পদ্মা বেগম, বড় ছেলের নাম শাহাবুদ্দিন ও ছোট ছেলের নাম ফরিদ উদ্দিন। ভাইবোনদের মধ্যে এত মিল, কেউ বলতেই পারবে না কোনটা আপন কোনটা পর।

পারুলের মা যেন সন্তানদের মা তাই তার মাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে সংসারে অধিষ্ঠিত। পারুলের মায়ের নাম মরিয়ম। ঐ নামে এখন আর কেউ ডাকে না। এখন

আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সবাই পারুলের মা বলেই ডাকে। আর সে গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত বড়মা ও বড় আপা হিসাবে।
পারুলের মায়ের আর একটি পরিচয় আছে, সে পশু পাখি ভীষণ ভালোবাসে। উঠানে পাখি বসলেই খাবার ছিটিয়ে দিবে। বাড়িতে তো কুকুর বিড়াল আছেই। পারুলের মাকে তার বাবা লাল রঙের এঁড়ে বাছুর দিয়েছিল। সেটাকে যত্ন সহকারে পালছে মরিয়ম। ভাব দেখে মনে হয় যেন ওটা ওর আর একটা মেয়ে। কলিমুদ্দিনরা মূলত কৃষক। কিন্তু বর্তমানে কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ব্যবসা করছে। সমস্ত জমি বর্গা দিয়ে দিয়েছে। তাই হালচাষ উঠে যাওয়াতে বাড়িতে গরুও নেই। গরু পাওয়াতে সবাই খুব খুশি। বিশেষ করে মরিয়ম। গরুটার লাল রং হওয়াতে মরিয়ম তার নাম রেখেছে লালু। ঐ লালু নামে সবাই তাকে ডাকে। গরুটির সমস্ত পরিচর্যা মরিয়ম নিজের হাতে নিয়েছে। বাড়ির চাকর গরুকে মাঠে খাওয়াতে নিয়ে যায় আর গোসল করিয়ে আনে শুধু। বাড়ির ভিতরে যত খাবার যত যত্ন নেবার সব মরিয়ম করবে। খাবার চাড়িতে জল দেওয়া, তরকারীর খোসা, ভাতের মাড় এসব কিছু মরিয়ম অতি যত্নের সাথে করে। জাংলা থেকে লাউ এনে কেটে দেওয়া, জমি থেকে বাঁধাকপি এনে কুচিকুচি করে নিজ হাতে কেটে লালুকে যত্ন সহকারে খাওয়াত।
একদিন কলিমুদ্দীন বাজার থেকে এসে পারুলের মা বলে ডাকতে ডাকতে অস্থির হয়ে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখে পারুলের মা অনর্গল বাছুরটার সাথে কথা বলেই যাচ্ছে। কলিমুদ্দীন রাগ করেই বলল, একি আমি তোমারে ডাকতে ডাকতে অস্থির আর তুমি কি করছ কওতো? বাজার আনছি, পাক করবা না, সারাদিন গরু নিয়া থাকলেই চলবো। এ কথা শুনে রেগে উঠল মরিয়ম, হ্যাঁ আমি সারাদিন গরু নিয়ে থাকি এ কথা কে কৈল তোমারে? মরণ আমার, বলে দপ দপ করে পা ফেলতে ফেলতে বাড়ির ভিতর চলে গেল।
অনেকদিন পর পারুল বাপের বাড়ি এসেছে, কিন্তু মাকে দেখতে পাচ্ছে না। মাকে খুঁজছে, হঠাৎ ঘরের পিছনে মায়ের গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখে মা লালুকে আদর করে খাওয়াচ্ছে, কিরে খাবি না, স্বাদ হয় নাই, কতো দেহি কি লাগবো? লবণ কম হইছে? আইনা দিমু? বলে যাবার উদ্যত হলেই পারুলের মুখোমুখি হয়ে গেল। পারুল মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মা তুমি লালুরে এত ভালোবাস, আমাগোতো এত ভালোবাস নাই। মা রেগে বলল, হ, তাতো কবিই, তগো ভালোবাসি নাই, যত্নও করি নাই, এমনেতেই এতবড় হলি, এখন তো মা হয়েছিস বুঝবি মা হওয়ার কি জ্বালা।
মরিয়ম গ্রামেরও সবার প্রিয়। ওর আদরে সেবা যত্নে লালু বড় হয়ে উঠেছে এবং লালু মা হতে যাচ্ছে। মরিয়মের আনন্দ আর ধরে না। সে লালুকে খাবারের বিশেষ যত্ন নিতে লাগল। বাড়ির লোকেরা ওর কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে। স্বামী কলিমুদ্দীন স্ত্রীর এত পরিশ্রম মোটেই পছন্দ করছে না। তাই স্বামী যখন বাড়ি থাকে না তখন মরিয়ম ঘর সংসারের কাজ ও লালুর যত্ন করে থাকে। মরিয়ম যেন লালুর সত্যিকার মা। লালুর বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে আসছে দেখে মরিয়ম মহাচিন্তায় পড়ে গেল। মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে গোয়াল ঘরে যাওয়া এত টেনশন করাতে কলিমুদ্দিনকে আরও বেশি করে টেনশনে ফেলে দেয়।
একদিন লালু একটি লাল রঙের বাছুর প্রসব করল। সবাই দেখে খুশি হলো। শুধু খুশি হলো না কলিমুদ্দীন কারণ ষাড় বাছুর তো ঘরে রাখা যাবে না বেচে দিতে হবে। কলিমুদ্দীন তো মরিয়মের নাড়ি নক্ষত্র সব জানে, তাই জন্ম থেকেই এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো। বাছুরটা দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। সমস্ত শরীর লাল, মাথাটাও লাল, লালের মধ্যে কপালে বড় করে সাদা দিয়ে লম্বাকৃতির টিপ যেন এঁকে দেওয়া হয়েছে। মরিয়ম স্বামীকে বলল, দেখ দেখ কি সুন্দর। সাদা রং দিয়া কি সুন্দর কইরা টিপ আঁইকা দিছে। ওর নাম রাখুম চান্দু। সবাই বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই অইবো।
আর একদিন কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে, লালু মাঝে মধ্যে ভয়ে জোরে জোরে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে শুনে মরিয়ম পড়ি কি মরি করে দৌড়ে মাঠে গিয়ে খোটা তুলে দিয়ে খোটা হাত থেকে ছাড়েনি। লালু উর্ধ্বশ্বাসে এমন করে দৌড়ালো যে মরিয়মকে টেনে হেঁচড়ে অনেক দূর নিয়ে গেলো। খোটাও হাত ছাড়া হলো মরিয়মও গরু ছাড়া হলো। হঠাৎ করে এমন ঝড়বাদল হবে কেউ ভাবতেও পারেনি। কলিমউদ্দিন এমন একটা চিন্তা করেই বাজার থেকে দৌড়ে আসতে দেখে মরিয়ম মাঠে পড়ে চিৎকার করছে আর ওর উপর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি বয়ে চলছে। কলিমুদ্দীন মরিয়মকে তুলে কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে এল। আর বাড়ির সবাইকে বকে গুষ্টি উদ্ধার করে দিলো, কলিমুদ্দীন সব ভাল করে দেখে বলল, যা হওয়ার হইছে।
অহন আর অত নাচানাচি চলবো না। ছোট ভাই ছলিমুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে মরিয়ম শহরে গিয়ে এক্সরে করে দেখল বাম হাতটা ভেঙ্গেছে। হাত প্লাস্টার করে আনল। মরিয়মকে বাড়ি এনে কলিমুদ্দীন তার সমস্ত দায়িত্ব নিজে হাতে নিল। একলা এক পাও এগুতে দেয় না, আর মনে মনে আফসোস করতে লাগল, আমি যদি বাড়ি থাকতাম তাইলে এমন হোত না। সব দোষ আমার। আমার তো বাইরে যাওয়ার তেমন দরকার ছিল না। হে আল্লাহ, আমার মরিয়মকে কষ্ট দিওনা, ওকে ভাল করে দাও।
মুরগীর খামারে মুরগীদের ঠিকমত খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা তারও ঠিকমত খোঁজখবর মরিয়মই নিত। একদিন মরিয়মের কুকুর বিড়াল তাদের মাকে দেখতে না পেয়ে বিড়ালটা মিউমিউ করতে করতে মরিয়মের বুকের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর কুকুরটা দুই পা দরজার চৌকাঠের ভিতর ঢুকিয়ে কুইকুই করে আদর জানাতে লাগল। এটা দেখে মরিয়ম কেঁদে ফেলে বলল, দেখ তুমি, পশুদের কত মায়া। আমারে না দেইখ্যা অগোর মনের দুঃখ কেমনি কইরা প্রকাশ করতেছে। এইটা দেইখ্যা কি তোমার মায়া লাগে না। কলিমুদ্দীন বলল, হ্যাঁ মায়া লাগে, সেজন্য আমার স্ত্রীরে হারাইবার পারুম না, তুমি ভাল হও।
তারপর সব হইবো। তুমি ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার কোন কথাই শুনুম না। তবুও মরিয়ম স্বামীর কাছে আবদার করেই যাচ্ছে, লালু ও চান্দুকে একবার দেখিয়ে

নিয়ে এসো। শেষ পর্যন্ত কলিমুদ্দীন স্ত্রীর আবদার ফেলতে না পেরে লালু ও চান্দুকে মরিয়মের থাকার ঘরের সামনে নিয়ে এল। লালু মরিয়মকে দেখে হাম্বা হাম্বা করতে লাগল। কলিমুদ্দীন তাড়াতাড়ি ওদের ওখান থেকে নিয়ে গেল।

ঘরের লক্ষ্মী অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে থাকলে কি কখনও মনে শান্তি থাকে। সেই যে কবে বিয়ে হয়ে এসে সংসারের হাল ধরেছে, আজ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের কার কি দরকার, কার কি সুবিধা অসুবিধা সব মরিয়ম দেখে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সমাধান করে। একদিকে মরিয়ম যেমন স্নেহময়ী ঠিক অন্যদিকে তেমনি সমস্ত পরিবারের তার পূর্ণ কর্তৃত্ব সঠিকভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে।

কলিমুদ্দীনের বাড়িতে উঠতে নিচ থেকে উপরে উঠে ডান দিকে বড় আকারের একটা ঝাপড়া কামরাঙা গাছ। গাছ ভর্তি কামরাঙা পেকে মাটিতে বিছিয়ে পড়ে থাকে। এই কামরাঙা লালুর ভীষণ পছন্দ। যখন ওকে মাঠ থেকে বাড়িতে আনা হয় তখন সে মনের আনন্দে তৃপ্তি সহকারে কামরাঙা খেতে খেতে বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলেই যায়। চাকর ওকে টানতে থাকে আর সে খেতেই থাকে। জোর করে বাড়ি নিতে হয়। বাড়ি ঢুকার অপর পাশে আছে দু'টো জাম্বুরা গাছ, ঐ গাছে বারমাস জাম্বুরা ধরে। গ্রামের ছেলেরা মিষ্টি কামরাঙার চেয়েও বেশি আকৃষ্ট টক জাম্বুরার প্রতি। কারণ, ওরা ঐ জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলে।

মরিয়ম বর্তমানে তার সংসার নিয়ে খুব খুশি। দু'টি মেয়ে ও দুটি ছেলেকেই বিয়ে দিয়েছে এবং দেওরের ছেলে-মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছে। মরিয়মের ভরা সংসার। ওদিকে মরিয়মের প্রিয় গরু লালু চান্দুর পর আর একটা বাচ্চা দিয়েছে। সাদা রং এর হয়েছে। সেটা এঁড়ে বাছুর। মরিয়ম তার নাম রেখেছে ধলু। চান্দুর চেয়ে ধলুকে সবাই পছন্দ করে ও আদর করে।

চান্দু বর্তমানে খুব দুষ্টু হয়েছে সেজন্য মরিয়মের খুব চিন্তা। একদিন কলিমউদ্দিন বলেছিল, আমাদের হাল নেই, গরুর গাড়িও নেই, ওকে রেখে কাজ নেই। এ কথা কিছুতেই মরিয়ম মানতে চায় না। একদিন দুপুরে সবাই খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছে তখন স্বামীর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছোট ভাই এসে এমন হাঁকডাক শুরু করলো যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। মরিয়ম এক হাত ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল "মশাই কনতো দেহি কি হইছে? এত চিক্কির পাড়তাছেন ক্যান?" এ কথা শুনে লোকটি আরও রাগান্বিত হয়ে বলল, তোমরা তো নাকে তেল দিয়ে দিবা নিদ্রা যাচ্ছ। এদিকে তোমার গরু আমাদের বাগান ভেঙ্গে তছতছ করে দিল। মরিয়ম বুঝতে পেরেছে তাই বড় ছেলের ঘরের ১০ বছরের নাতনীটাকে বলল, যা তো নাছরিন চান্দুটারে নিয়া আয়।

আচ্ছা, যাইতেছি। আহেন কর্তা। বলার সঙ্গে সঙ্গে কর্তা রেগে বলল, একি এতটুকুন মেয়ে কী করে এমন উন্মত্ত ষাড়কে আনবে, তাছাড়া খালি হাতে, দড়িও নেয়নি। মরিয়ম বলল, কিচ্ছু লাগবো না কর্তাবাবু। আপনি মেয়েডার সাথে যান।

নাছরিন যখন প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে পৌঁছাল তখন দেখল চান্দু ও বাগানের গাছ তছতছ করে ফেলছে। নাছরিন দৌড়ে এসে ডাক দিল, চান্দু। অমনি চান্দুর উন্মত্ততা থেমে গেল। মাথা নিচু করে মেয়েটার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল। কর্তাবাবু এহেন কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে বাড়ির সবাইকে ডেকে বলল, দেখ, এতটুকুন মেয়েকে দেখে কেমন সুন্দর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাছরিন বলল, আয় আয় অমনি নাছরিনের পিছে পিছে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। নাছরিন কর্তাকে বলল, কর্ত্তা, ও আমাগের খুবই বাধ্য। আর কিচ্ছু কইবো না।

গরু নাছরিনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি গেল। এত বাধ্য চান্দু, বাইরে গেলেই কেমন যেন হয়ে যায়। কলিমুদ্দীন এ কথা শুনে মরিয়মকে বলল, আমি আর ওরে রাখুম না ওর জন্য লোকের বকা খামু নাকি? এরপরে কি না কি করবো শেষ পর্যন্ত জেলে পাঠাইবো না কি তাই বা কে কইবো? মরিয়ম ছ্যাৎ করে উঠল, যাও তোমার যত কুকথা। বোবা জীব, না হয় একটু ভুল করছে, শক্ত দড়ি দিয়া বান্ধ্যা রাখলেই সব ঠিক থাকবো।

এইভাবে প্রতিদিনই চান্দু সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের নালিশ আসতে লাগল, কলিমুদ্দীন শান্তিপ্রিয় লোক, পাড়ায় বা গ্রামে কারও সঙ্গে তার কোন রকম ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্য হয় নি। নানা লোকের নানা কথায় সে খুবই অপমানিত হচ্ছে। কলিমুদ্দীন মহা মুশকিলে পড়ে গেল গরুটিকে নিয়ে। সবাই বলছে বিক্রি করে দাও। জঞ্জাল সরিয়ে ফেলাই ভাল। কিন্তু মরিয়মের কাছে চান্দু জঞ্জাল নয়, অতি আদরের ধন। এখানেই তো মহা বিপদ। সে ছোট ভাই ছলিমউদ্দিনকে ডেকে পরামর্শ করতে বসল। সেও ঐ একই কথা বলল, বিক্রি করে দিতে। বাড়ি শুদ্ধ সবারই এক মত। তাই ছলিমুদ্দিন বলল, ভাই তুমি ভাবীর সাথে একান্তে আলাপ কর এবং রাগ না কইরা মিষ্টি ভাষায় বুঝাও, যাতে ঝগড়া না বাজে।

- ভাইরে বুঝাইয়া হয়রান হইয়া গেছি। আর পারি না। এখন কি করমু। আমি পড়ছি দোটানায়। লোকের নানা গালিগালাজ সহ্য করবার পারি না। আবার মরিয়মের করুণ অবস্থাও সহ্য করবার পারতেছি না, কও তো অহন আমি কি করমু?

- তুমি গরুটা বেইচা দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হও। ভাবী আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হইয়া যাইবো। আমরা সবাই ভাবীরে বুঝামু।

কলিমুদ্দিন স্থির করল চান্দুটাকে সত্যিই বিক্রি করে দিবে, সেটা মরিয়মকে জানিয়ে এবং মরিয়মকে সামনে রেখেই ক্রেতার হাতে চান্দুকে দিয়ে দিবে, যাতে সে ব্যথা একটু কম পায়। কলিমুদ্দীন মরিয়মকে ডেকে বলল, চান্দু তো খুব দুষ্টামী শুরু করছে, তাই ওরে অন্যগ্রামে পাঠাই। তাতে ওর দুষ্টামী একটু কমলে আবার নিয়া আসুম। মরিয়ম বলল, সত্যি কইতেছ আবার আনবা? কলিমুদ্দিন বলল, হ? কয়দিন পরই আনুম। লোক হাতে যখন কলিমুদ্দীন চান্দুর দড়ি ধরিয়ে দিচ্ছে তখন মরিয়ম লোকটাকে বলল, ও মিয়া শুনেন, আমার চান্দু কিন্তু খুব আদরের ওরে দিয়ে হাল বাহাবেন না। লোকটা বলল, না হাল দিমুনা।

-গাড়ি চালাবেন না, বলে কাঁদতে লাগল মরিয়ম।

- না না কিছু করামু না।
- ঘানি টানাবেন না।
- কইলাম তো খুব আদরে রাখুম।
লোকটাকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য কলিমুদ্দীন ইশারা করতেই সে তাড়াতাড়ি গরুটাকে নিয়ে চলে গেল।
বাড়ির ভিতরে এসে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মরিয়ম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কলিমুদ্দীন ওর পিছনে পিছনে এসে বিছানার পাশে বসে মরিয়মের মাথা ও শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে দিতে বলল, চান্দু বেড়াবার গেছে, তাতে কানদার কি আছে? আমি কোথাও গেলে কি তুমি এমনি কইরা কান্দ? ওঠ ওঠ। আমার ভীষণ খিদা লাগছে। খাইবার দেও। কওতো কি রানছ, ধমক দিয়ে মরিয়ম বলল, কি আর রানমু যা বাজার করছ তাই রানছি।
এই ঘটনার পর থেকে মরিয়ম স্বামীর সাথে কথাবার্তা কম বলে। আর স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে। বুঝাতে গেলেও উল্টো ফল হয়।
এহেন কষ্টে আর কোনদিনও পড়েনি কলিমুদ্দীন। মরিয়ম বলে, তুমি চান্দুরে বেইচা দিলা তা আমারে কইলে কি হইত? কইলা না ক্যান? আমারে মিছা কথা কইলা ক্যান? তোমারে আমি এত বিশ্বাস করি ভালোবাসি, ভরসা করি, সেই তুমি আমারে ফাঁকি দিলা? কামডা কি ভাল করলা? কলিমুদ্দীন কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল।
- অহন চুপ কইরা বইসা থাকলে কি হইবো? জবাব দেও।
- আমারে মাফ কর মরিয়ম, আমি বুঝবার পারি নাই। আমার অন্যায় হইছে। তুমি যদি আমারে মাফ না কর তবে আমি কোথায় যামু? কার কাছে দাঁড়ামু। তা হইলে আমি অহন কি করুম সেটা তুমিই কইয়া দেও।
- এখন পাক ঘরে যাও, ছোটবৌ খাবার নিয়া বইসা রইছে, রাইত তো কম হয় নাই।
- আমি যামু কিন্তু তোমারও যাওন লাগবো। তুমি না গেলে আমিও যামু না।
- তোমার যাওয়ার সঙ্গে আমার যাওয়ার কি সম্পর্ক?
- কি বলেরে এত তাড়াতাড়িই সম্পর্ক কোনদিন শেষ হয়?
- চুপ করতো বাজে কথা কইওনা।
- কতদিন হয় তোমার হাতে খাওয়া হয় নাই। নও আজ তুমি ভাত বাইড়া আমার সামনে দিবা, তা হইলে বুঝুম তুমি সত্যিই আমারে মাফ করছো।
চল বলে মরিয়ম পাক ঘরের দিকে চলল।
- নও তোমারটা আর আমারটা এক সঙ্গে বাইড়া আনো, দুইজনে এক সাথে খাই।
- কি যে কও তুমি? কবে তোমারে না খাওয়াই বাইড়া আমি খাইছি?
- না খাইলা আইজ খাইলে দোষ কি?
মরিয়ম কলিমুদ্দীনকে অনেকদিন পর যত্ন সহকারে ভাত বেড়ে দিল। কলিমুদ্দিন মহা খুশি।
মরিয়ম আদর করে করে বলছে, আর এক টুকরা মাছ দিমু? একটু ঝোল দেই, তুমি না থোরঘন্ট ভালোবাস চিংড়ি মাছ দিয়ে তোমার জন্যই পাক করা হইছে। আর একটু নেও। এইভাবে যাচাই করে মরিয়ম স্বামীকে খাওয়াল। অনেকদিন পর স্ত্রীর হাতে এমন যত্নে খাবার খেয়ে সেও খুব তৃপ্তি পেল। আজ যেন কলিমুদ্দীন আহ্লাদে ডগমগ। বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, অম্বল রান্ধ নাই পারুলের মা?
- তা আবার না রানলে হয়? হ, রান্ধিছি।
- কীসের অম্বল গো?
বরই এর অম্বল তোমার প্রিয় অম্বল। কলিমুদ্দীন বলল, দুই একটা তেঁতুলের রোয়া ছিটাইয়া দেও নাই?
- সব দিছি খাইয়া দেখ, এই দিতেছি।
- তুমি তাড়াতাড়ি খাইয়া আসো, এ কথা বলে কলিমুদ্দীন খেয়ে হাত ধুতে বাইরে গেল।
আজকাল কলিমুদ্দীনের মন মেজাজ খুব ভাল। দু' জন এক সঙ্গে খাটের উপর বসে গল্প করে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে। নানা রকমের তামাশা করে। মরিয়মকে নিয়ে খেয়ে পারুল মামার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব দিল। মরিয়ম বলল, না- যামুনা, ক্যান যামু? অগোর যে একটা বুইন আছে তারে দেখবার আসে? শুধু অনুষ্ঠানটিতে দাওয়াত দিলে আসে। তাছাড়া কি কখনও আসে, আমিতো মনে করুম আমার কেউ নাই।
পারুল নাছোড়বান্দা। মাকে বলল, বাঃ বাঃ ছোট ভাই না বুঝে দোষ করলে বড় আপা কোথায় দোষ সংশোধন করবো তা না কইরা পাল্টা অন্যায়ই কইরা যাইতেছে। পাল্টাপাল্টি রাগ না কইরা চল তো মামাগোর সাথে দেখা কইরা আসি। তোমারও মনটা ভাল লাগবো। আমাগেরও আনন্দ লাগবো। পারুলের বাবা এসে বলল, কোথায় যাওয়া হইতেছে আমারে রাইখ্যা। পারুল বলল, বাবা তুমি যাইবা, তা হইলে তো খুবই ভাল হয়।
- কোথায় যাবি তাই কইলি না।
- কোথায় আবার, আমার মামার বাড়ি।
- ও তগোর মামার বাড়ি, আমার শ্বশুর বাড়ি, মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, তা আমার গিন্নি কি কয়?
ঠিক হলো ওরা সপরিবারে মামার বাড়ি যাচ্ছে।
রসুলপুর ওদের মামার বাড়ি। সবাই মিলে হঠাৎ করে মামার বাড়ি উঠল। নানী কলতলা থেকে পানি নিতে এসে ওদের দেখেই আনন্দে আটখানা-ওগো দেইখ্যা যাও কারা আইছে রুকাইয়া, সুরাইয়া তুরা সব কনে গেলি, দেইখ্যা যা। এ কথা বলেই নিজের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে জামাইকে বলল, সেই কত দিন হয় তুমি আসো না, কও তো দেহি। যাইক খুব খুশি অইছি। যাও ঘরে যাও।
রসুলপুরে মামা-মামী, নানা-নানী, মামাত ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ওদের দিন ভালই কাটল। নানা-নানী নাতিপুতি পেয়ে খুশিতে দিন কাটাতে লাগল। মরিয়ম

যাওয়ার কথা বলায় ওর মা রাগ করে উঠল। কলিমুদ্দীন দেখল, এখানে এসে মরিয়ম বেশ হাসি-খুশিভাবে দিন কাটাচ্ছে, আর কয়টা দিন থেকেই যাই। সবার ইচ্ছাতে ওরা কয়েকটা দিন আনন্দেই কাটাল।

যখন ওরা চলে আসবে তখন ওর মা গাছের নারিকেল, খেতের আলু, বেগুন, পটল, শাক, মুড়ি-মোয়া, দুধের খিরের সন্দেশ পোটলাপাটলি করে মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দিল। মায়ের কথা, আমার একটা মেয়েই তাকে তেমন কি দিতে পেরেছি, সামান্য একটু এটা সেটা। তেমন কিছু তো নয়। ওরা সবাই মিলে ঘোড়ার গাড়ি করে বকুল গঙ্গা চলে গেল। খুব দূর নয়তো, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ওদের গ্রামে এসে পৌঁছাল। মরিয়ম গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখে মাঠে গরুটা মরিয়মের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মরিয়ম দৌড়ে লালুর কাছে গিয়ে লালুকে আদর করে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বর্ষাকাল। একদিন সারারাত প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট পানিতে থৈ থৈ করছে। সকালে চাকর এসে গোয়াল ঘর খুলে গরু বের করে দিল। প্রতিদিন গরু বের করার সময় মরিয়ম এসে গোয়ালের সামনে দাঁড়ায়। গরুগুলোর গায়ে হাত দিয়ে আদর করে। তখন চাকরটা মরিয়মকে বলল, মা দেহেন তো ধলু কেমনে কাঁপতাছে।

- সত্যিই তো, এই দিকে নিয়া আয় দেহি ভাল কইর‍্যা। মরিয়ম ধলুর গায়ে হাত দিতেই শরীরতো জারিয়ে উঠে না, লোমগুলো একবারও কেঁপে উঠল না। তখন মরিয়ম বুঝল ওর কোন রোগ হয়েছে। মরিয়ম আর দেরী না করে স্বামীকে সব বলল, স্বামী ওকে ভাল করে দেখে বুঝতে পারল মরিয়মের কথাই ঠিক। তখনি ধলুকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু শুধু কাঁপতে লাগলো। আর মাথা নিচু করে রাখে। ডাক্তার নানাভাবে পরীক্ষা করল, কিন্তু ডাক্তার কোন রোগনির্ণয় করতে পারল না। তবুও প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ডাক্তার ঔষধ দিয়ে দিল। মরিয়মের ব্যস্ততায় কলিমুদ্দীন বিকালে গ্রামের অন্য একটি পশু হাসপাতালের ডাক্তারকে ডেকে আনল। কারণ ধলু কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়েছে।

এখন আর ওর চলাফেরা করার শক্তি নেই, ডাক্তার এসেও খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। কিন্তু কোন ডাক্তারই রোগ ধরতে পারল না। ডাক্তার চুপিচুপি কলিমুদ্দীনকে বলে গেল যে আজ রাতটুকু ওর হায়াত, আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।

ডাক্তারের কথা ঠিক ঠিক ফলে গেল। ভোরের আজানের পর ধলু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ওখানে সারারাত মরিয়ম ও কলিমুদ্দীন বসে ছিল। ছোট বাচ্চার অসুখ হলে যেমন মা বাবার ব্যস্ততা বাড়তে থাকে তেমনি ধলুর অসুখে ওরা দু'জনই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ধলু যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন মরিয়ম দোয়া পড়ছিল এবং হাত দিয়ে ধলুর চোখ বুজিয়ে দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কাঁদাকাঁটির পর সবাই এক প্রকার প্রায় জোর করে মরিয়মকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে এল এবং গরুটাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করল। ভাগাড়ে ফেলে দিলে মরিয়ম আরও কেঁদে কেটে অস্থির হবে। তাই মরিয়মের সম্মানার্থে ও মরিয়মের ইচ্ছানুসারে ওকে বাড়ির পালানের পশ্চিম পাশে ক্ষেতের দিকে কবর দেওয়া হলো।

সারাটাদিন নাওয়া খাওয়া কিছু করেনি। ছোট জা খাবার এনেছে। ওখানে কলিমুদ্দীন বসে আছে, আর বারবার খাওয়ার কথা বলছে। ছোট বলল, আপা, যদি তুমি না খাও তবে ভাইজানও খাবো না। উনি না খাইলে তো উনার অসুখ বাড়বো, তুমি কি তাই চাও? চোখ মুছতে মুছতে মরিয়ম বলতে বলতে এগিয়ে গেল, মরার পেট না খাইলে মানবো না আগে পেটেরে খাওয়াই নেই। ছোট ওকে ভাত মাখিয়ে খাওয়ায়ে দিলো। দু'বার মুখে দিয়ে মরিয়ম বলল, খাইছি তো। সবার কথা রাখলাম। যা তোর ভাইজানকে খাইতে দে অনেক বেলা হইছে।

খেয়ে না খেয়ে মরিয়মের দিনগুলো নিদারুণ কষ্টে কাটছে। অন্তর দিয়ে অনুভব করার কেউ নেই, এটাই ভাবে মরিয়ম। ওর ধারণা যাই থাক, কলিমুদ্দিন স্ত্রীর দুঃখে অন্তরজ্বালায় জ্বলে মরছে। আগে একটু বুঝালেই হাসিমুখে মেনে নিতো, এখন যেন কেমন নিশ্চুপ থাকে। ভাল-মন্দ কিছুই বুঝা যায় না। এতে কলিমুদ্দিনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। আজকাল মরিয়ম বড় গরু লালুকে তেমন দেখাশুনা ও আদর যত্ন করে না। মাঝে মাঝে কখনো গোয়ালে যায়।

এইভাবেই চলছে দিন। একদিন মরিয়ম লক্ষ্য করল লালু ভাল করে খাবার খায় না। চাড়িতে মুখ দিয়ে সামান্য খেয়ে চাড়ির পড়েই শুয়ে পড়ে। ওর ভাব দেখে মনে হয় যেন কত অরুচি তাই কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, আর শরীরে কত আলসেমীভাব, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে চাড়ির পাড়ে শুয়ে পড়ে। তার আদরের লালুর এমন অবস্থা দেখে বসে থাকতে না পেরে স্বামীর কাছে গিয়ে সব কথা বলল। স্ত্রীর কথা শুনে স্বামীও লালুকে দেখল গোয়ালের পারে শুয়ে আছে, কলিমুদ্দীন লালুকে হাত দিয়ে তুলে দিল লালু উঠে দাঁড়াল এবং চাড়ি থেকে হাত দিয়ে খাবার তুলে লালুর মুখে দিল, কিন্তু একবার মাত্র মুখে নিল। দ্বিতীয়বার মুখ সরিয়ে নিল। এটা দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মনে মনে ব্যথা পেল, নিশ্চয়ই কোন অসুখ হয়েছে। কলিমুদ্দীন বিকালেই পশু হাসপাতালে লালুকে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে রোগ ধরতে না পেরে পরের দিন আসতে বলল।

শেষ পর্যন্ত কফ পরীক্ষা করে জানা গেল লালুর যক্ষা হয়েছে। শুনেই তো মরিয়ম কান্না আরম্ভ করল।

আমার লালু আর বাঁচবে না, আল্লাহ তুমি একি করলে। তুমি আমার লালুকে ভাল করে দাও। বাড়ির বড়রা বুঝাতে লাগল, ওষুধ খেলেই লালু ভাল হবে, তুমি এত কেঁদো না।

কে কার কথা শুনে। ইদানিং গোয়ালঘর থেকে খুব একটা বের হয় না লালু। যদিও বা চাড়ির পারে আসে তাও ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চার পা এদিক ওদিক আঁকা বাঁকা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যায় এবং লালুও মাটিতে পড়ে যায়, এটা দেখেই মরিয়ম কাঁদতে থাকে। কলিমুদ্দীন ওকে ধরে ঘরে নিয়ে আসে।

দুপুরে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছে। তখন চাকরটা লালুকে খেতে দিতে যেয়ে দেখে লালু ঘরে নেই। মরিয়মকে এ খবর দিতে এসে দেখে যে লালু উনার বারান্দায় শুয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে, তখনই চাকরটা মরিয়মকে ডাকতে লাগল। মরিয়ম ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় লালুকে দেখে ওর মুখের কাছে বসে পড়ে সবাইকে ডাকতে আরম্ভ করে।

বাড়ির সবাই লালুর অবস্থা দেখে বুঝল, আর সময় নেই, তাই শেষ দেখা করতে মায়ের ঘরে এসেছে।

মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বলছে, এত ভালোবাসা, তুই না পশু তোর সাথে আমার সামাজিকতা আত্মীয়তা ও রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। আছে শুধু মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও আত্মিক টান তাই তুই এত ভালোবাসিস আমাকে?

মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বলল, অরে কিন্তু তোমরা ভাগাড়ে দিওনা, মা মেয়েরে একখানে রাইখা দাও। পালানের পশ্চিম পারে রাস্তার ধারে ওখানে রাইখো।' এই কথা বলে সেই যে মরিয়ম ঘরে ঢুকল সারাদিন রাতে আর বের হলো না। সমস্ত চাপ গিয়ে পড়ল কলিমুদ্দীনের উপর।

মরিয়মকে উঠিয়ে হাঁটাচলা করানো দরকার। ঠিকমত চারটে খাওয়ানোর দরকার। যা একটু কথা শুনে তা কলিমুদ্দীনের কথাই শুনে। অন্যদের কারও কথা শুনে না। তাই এ গুরুদায়িত্ব কলিমুদ্দিনের নিতে হয়েছে। তারও তো বয়স হয়েছে। সেই বা কত পারবে।

মরিয়ম আজ সকালে খেল। সারাদিন কেউ তাকে খাওয়াতে পারল না অথবা সারাদিন খেল না, কলিমুদ্দীন বাইরে থেকে এসে রাতে সামান্য একটু খাওয়ালো। এইভাবে তো আর শরীর টিকে না। দিনে দিনে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে কলিমুদ্দীন মরিয়মকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে শহরে গেল। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিল। সেগুলো করাতে দিয়ে এসে কলিমুদ্দীন আল্লাহকে ডাকতে লাগল। হে আল্লাহ আমার মরিয়মকে ভাল কইরা দেও।

দুদিন পরে রিপোর্ট এলে কলিমুদ্দীন ছোট ভাই ছলিমুদ্দীনকে বলে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ছলিমুদ্দীন ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কিছু করার নেই, আল্লাহ আল্লাহ কর।

লালুর যখন যক্ষ্মা হয়েছে তখন মরিয়ম সর্বদা লালুকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। আস্তে আস্তে লালুর রোগটা মরিয়মের উপর সংক্রমিত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মরিয়ম শয্যাশায়ী। বাড়ির মেয়েরা সব শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, ভাইবোন সবাই ওকে দেখতে এসেছে।

এখন এমন অবস্থা-সম্ভাবনা খুব কম। সবার প্রতি মায়া-মমতা এখনও একফোঁটাও কমেনি।

ছেলেমেয়ে কেঁদে অস্থির হয়ে তার অতি কাছে গেলে মা বলে উঠে সরসর ছুঁইস না, আমার সোনাগের জানি এ রোগ না হয়। আল্লাহ তুমি তাগোর রক্ষা কর।

ডেকে কোরান শরীফ পড়াচ্ছে আল্লাহর নাম নেওয়া হচ্ছে। সকাল থেকে মরিয়মের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে।

গলার স্বর বসে যাচ্ছে, কথা অস্পষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যে কলিমুদ্দীনকে কাছে ডেকে এনে বসিয়ে হাত ধরে কাঁদতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কলিমুদ্দিনও কাঁদতে লাগল। এই কান্না দেখে ঘরের সবাই কেঁদে উঠল। মরিয়ম হাত উঁচু করে ওদের কাঁদতে না করতে করতেই ওর হাতখানি ঠাস করে পড়ে গেল। সবাই বুঝতে পারল মরিয়ম না ফেরার দেশে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রঙের ডানা

ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস দীপ্তি ব্যানার্জীর খুব পছন্দ ময়মনসিংহ শহর। যখনই ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোন স্কুল পরিদর্শনে যায়, তখন সে তার পছন্দ করা ঘরে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে উঠে। ওখানকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও সে কথা জানে। ওখানে একটা রুমই আছে, যেটাতে সাধারণত ভি.আই.পি'রা উঠে থাকে। ওই রুম ছাড়া দীপ্তির চলবেই না। আগে থেকেই খবর নিবে রুমটি খালি আছে কিনা। আর ওটা খালি হলেই বুকিং নিয়ে নিবে। তখন যাতায়াত অত সহজ ছিল না। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ ও জামালপুর ট্রেন চলাচল করে। যে সময়কার কথা বলছি সেটা ছিল পাকিস্তান আমল। দীপ্তি ঠিক করেছে আগে ময়মনসিংহ এসে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউজে উঠবে ওখানকার কাজ সেরে জামালপুর যাবে। সার্কিট হাউজের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা প্রায় সবাই দীপ্তির পরিচিত। একটা ইজি চেয়ারে বসে পিঠে রোদ লাগিয়ে সে একটি ম্যাগাজিন পড়ছিল।

এমন সময় বেশ কয়েকজন লোকের কথার আওয়াজ ও কোলাহল শুনতে পেয়ে দীপ্তি ঘরের ভিতর চলে গেল। দারোয়ান ডেকে কঠিন গলায় উচুস্বরে বলল, ঐ দেখতো ৫নং রুমটায় কে আছে? তাকে বল রুম ছেড়ে দিতে। দীপ্তি শুনেও চুপ করে রইল। বলগে, একজন ভি.আই.পি এসেছে, তাই রুম ছেড়ে অন্যরুম বুকিং নিতে। দারোয়ান দীপ্তির ঘরে গিয়ে কথাগুলো বলল।

দীপ্তিতো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে। সেও বলল, কেন? এ তো আমার বুকিং করা রুম, আমি ছাড়বো না। ঘরের বাইরে থেকে পুরুষ কণ্ঠে বলল, ভি.আই.পি. আসলে ছেড়ে দিতে হয়, এটাই নিয়ম। কথা বাড়াবেন না, ছেড়ে দিন। আমি কে জানেন? আমি ময়মনসিংহ জেলার এস.পি.।

-যেই হোন না কেন? না কোন অবস্থাতেই আজকে রুম ছাড়বো না।

– কি বললেন, ছাড়বেন না? তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখবো কি করে রুম না ছাড়েন।

- বেশ ব্যবস্থা নিন। কীসের ব্যবস্থা নিবেন পুলিশী শক্তির না নারীকে দুর্বল পেয়ে পৌরুষের বীরত্ব দেখাবেন। আচ্ছা কি করতে চান বলুনতো বলতে বলতে বাইরে এসে পড়ল দীপ্তি। আর এস.পির মুখোমুখি হতেই এস.পি বলে উঠল তুমি! দীপ্তি অবাক হয়ে শংকরের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শংকর ততোধিক অবাক হয়ে বলল, দীপ্তি দীপু তুমি এদেশে এখনও আছ! তোমায় আমি কত খুঁজেছি। আজও খুঁজে চলছি। ভগবান আজ তোমার খোঁজ পাইয়ে দিল। দীপ্তি এসো, আসবে না আমার কাছে?

শংকর আবেগ ও ভালোবাসায় যেন দীপ্তিকে এখনই ওর গৃহে নিয়ে যায়। শংকরের কথা শুনার অপেক্ষায় না থেকে দীপ্তি শংকরের মুখের উপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল।

আর অমনি শঙ্কর বন্ধ দরজায় আছড়ে পড়ে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করতে করতে অস্থির হয়ে দরজার গোড়ায় বসে পড়ে ছোট বাচ্চার মত হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তার সহচর পুলিশরা তাদের অফিসারের এহেন অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এ কেমন পুলিশ অফিসার! যাকে সারাজীবন কঠোরভাবে দুষ্টের দমন করতে দেখেছি, কখনও নরম হতে দেখেনি, কান্নার তো প্রশ্নই উঠে না এমন দৃঢ়চেতা মানুষ। দীপু তুমি বাইরে এসো সারারাত শুধু সারারাত নয়, সারাজীবন আমি তোমার অপেক্ষায় এই দরজায় ঠেস দিয়ে থাকবো। আমি ভুল করেছি দীপু, তুমি তোমার প্রিয়তমকে মাফ করে দাও, আর এমনটি হবে না? মানুষ মাত্রই ভুল করে।

চোখের উপর সূর্যের আলো পড়াতে শঙ্কর জেগে উঠল। সে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ জেগে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে দরজা খোলা দেখে খুশি হয়ে শঙ্কর ঘরের ভিতরে ঢুকে অন্ধকার হাতড়ে দীপ্তিকে খুঁজছে আর নাম ধরে ডাকছে। ততক্ষণে অন্যান্য পুলিশও এসে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে। সার্কিট হাউজের এতটুকুন ঘরে কোথায় আর পালিয়ে থাকবে। শঙ্কর জেগে উঠে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল কেন আমি ঘুমালাম। আমার দীপুকে পেয়েও হারালাম। তোরা খোঁজ, ভাল করে খুঁজতে থাক। নিশ্চয়ই পাবি, যাবে কোথায়? ঐকান্তিক ভালোবাসার কাছে সবকিছুরই পরাজয় হয়ে থাকে। আমার এ ভালোবাসা অকৃত্রিম। একবার যখন পেয়েছি তখন আমি খুঁজে পাবোই দীপুকে।

অনেকদিন আগের কথা, পাকিস্তান আমলের তখনকার দিনের মানুষ সৎ ছিল এবং আন্তরিক ছিল। আজকের মত ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ছিল না। কালের প্রবাহে এগুলোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দীপ্তি ব্যানার্জীর বাবা বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। খুবই নামকরা শিক্ষক। যতীন্দ্র ব্যানার্জী নাম শুনলেই সবাই চিনে।

ছোট্ট শহর টাঙ্গাইল, মহকুমা শহর। তাই সবাইকে সবাই চিনে। দীপ্তিরা দুই বোন- দীপ্তি আর জয়ন্তী। দীপ্তি ও ওর বোন দেখতে ভারী সুন্দর। দীপ্তি তো দেখতে মা দুর্গার মত অপরূপ রূপসী। যে দেখে সেই তাকিয়ে থাকে। পাশের বাড়ির মহামায়া সর্বদাই ওদের সঙ্গে থাকে। দীপ্তি যখন ৩য় শ্রেণিতে পড়ে মহামায়া তখন ২য় শ্রেণিতে এবং জয়ন্তী ১ম শ্রেণিতে পড়ত। ওরা ছোট বেলা থেকে একসঙ্গে স্কুলে যেত এবং বাড়ি আসত। তখন কাঁচা রাস্তা, কোন যানবাহন নেই, লোকজনের ভিড়ও নেই।

সেই কাকডাকা ভোরে দীপ্তি উঠে ছোট বোন এবং প্রতিবেশী মহামায়াকে ডেকে ঠাকুরের পূজার জন্য ফুল তুলতে বের হতো। শীতে গাঁদা, শরতে শিউলী, গ্রীষ্মে বেলী ও গন্ধরাজ, তাছাড়া কাঠগোলাপ, টগর, নয়নতারা ইত্যাদি ফুল বারোমাস ফোটে, ওগুলো তুলে বলতো ওরা শীতের সকালে শিশিরে পা ডুবিয়ে ফুল নিয়ে বাড়ি ফেরে। ওদের কেউ কোনদিন কিছু বলতো না। যখন ওরা ৭ম-৮ম শ্রেণিতে পড়ে তখন দীপ্তির মা পাড়ার ছেলেদের বলে রাখত, আমার মেয়েরা ও পাড়ার

মেয়েরা ভোর বেলায় উঠে ফুল কুড়োতে যায়, তোমরা একটু ওদের প্রতি লক্ষ্য রেখো, শংকর মিত্র তখন ১০ম শ্রেণিতে পড়ে।

শংকর মিত্রের বাবা টাঙ্গাইলে ওকালতি করত। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। তাই শংকর ওর এক ভাই, এক বোন ও মা-কাকাদের সংসারে থাকে। তবে কাকারা ওদের খুবই ভালোবাসে। দীপ্তিদের বাড়ি যায় কিন্তু সেটা দীপ্তির আর্কষণে নয়। দীপ্তির ছোট পিসি দীপ্তিদের বাড়ির উল্টোদিকে ওদের বাড়ি। শংকরের কাকার নাম মিত্র সেও একজন নামকরা ব্যবসায়ী। কালীবাড়ি লাগোয়া শংকরের বাড়ি। শংকর মাঝেমাঝেই দীপ্তিদের বাড়ি যায় অপরূপাদির জন্য। কারণ অপরূপাদি ছোট বাচ্চা, পশুপাখি ইত্যাদি ভালোবাসে। এই ভালোবাসার ভাগ পেয়েছিল শঙ্কর। তাই সেই স্নেহের আকর্ষণে অপরূপার ন্যাওটা হয়ে উঠে শংকর। প্রথমে অপরূপাকে শঙ্কর অন্যদের মত দিদি বলে ডাকত। কিন্তু এত স্নেহ পেয়ে ছেলেটা ভুলে গেল দিদি ডাক। একদিন অপরূপাকে বলেই ফেলল, 'আমি আর তোমাকে দিদি ডাকবো না, তুমি আমাকে যেভাবে মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট করেছ। তাতে মা ছাড়া অন্য কোন ডাকে তোমাকে ডাকতে পারবো না।', অপরূপা ওকে জড়িয়ে ধরে মাতৃস্নেহের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করল। এতে শংকরের চোখে জল এসে পড়ল। অপরূপাকে সবাই একটু সহজ নামে অপু বলে ডাকে। শংকর সবার সামনে অপুকে মা বলে ডাকতে লজ্জা পায়, তাই ডাকে না। শংকর বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয়ে পড়ে। ছাত্রও মোটামুটি ভালই। শংকরের ধারণা টিউশন পড়তে পারলে ওর রেজাল্ট ভালো হবে। তাই একদিন অপুর কাছে তার দুঃখের কথা খুলে বলাতে অপু বুঝে বলল, শোন বাবা আমি তোমাকে টিউশন পড়তে ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিন্তু যদি তোমার কাকা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হোন? শংকর বলল, আমি জানতেই দিবো না, নিশ্চিন্তে থাক।

অপু বিশ্বাসবেতকা যেয়ে সবচেয়ে ভাল শিক্ষক, প্রায় সব বিষয়ই পড়ান তাকে উচুদামের বেতন দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিল। একদিন শংকর বলল, তাই বলে এত টাকা দিয়ে আমাকে শিক্ষক রেখে দিলে, এটা ঠিক করনি মা। অপু বলল, এমনকি বেঠিক করেছি, আমার ছেলে জীবনে একটা আবদার করেছে তা আমি মা হয়ে রাখবো না তাই কি হয়? ছেলের ভাল কে না চায়। আমি চাই আমার ছেলে পরীক্ষায় ভাল ফল করুক। শংকর কি আর করবে? বলল, বেশ তাই হোক।

অপরূপা যেমন সুন্দরী, নাচে গানেও পারদর্শী। অপূর্বর ব্যবহারের জন্য সবাই তাকে খুবই ভালোবাসে। স্থানীয় একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। স্কুলটির নাম আদর্শ প্রাইমারি স্কুল। এই নামে কেউ চিনে না। সুনীল ভাদুড়ী নামে এক শিক্ষক ছিল, তার পদবী দিয়েই সবাই চিনে ভাদুড়ী স্কুল নামে। মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটক ইত্যাদি অপুদি শিখিয়ে থাকে। উনার বাড়ির পাশেই কালীবাড়ী। অষ্টপ্রহরের সময় মেয়েদের রাধাকৃষ্ণ ও অষ্টমী সাজিয়ে আসরে তাদের দিয়ে নাচ করাত। এত মিশুক ছিল, ছোট বড় সবার সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা ছিল।

শংকরেরও কিছুটা স্বভাব অপুর মত পেয়েছে, সেও ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালোবাসে। তাদের নিয়ে খেলা করে, দীপ্তির ঠাকুরদা উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বিরাট বাড়ি। সে একজন নামকরা উকিল। তার বাড়ির সামনে বড় একটি খেলার মাঠ। সেই মাঠে ছেলে-মেয়েরা খেলাধূলা করে। আর শংকর ছোটদের খেলাধূলা শেখায়, এইভাবে শংকর সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আছে।

শংকরের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর অফুরন্ত সময়। তখনকার দিনে বেড়াতে যাওয়ার মত তেমন সুবিধামত জায়গা ছিল না। আত্মীয়ের বাড়ি, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি এই সমস্ত জায়গায় বেড়াতে যেয়ে থাকে। তাই দীপ্তির বোন আর মহামায়াকে সঙ্গে করে শংকরদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে গেল লোহার গাড়ি করে। তখনকার দিনে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। ওদের গ্রামের বাড়ি ছিল বার্তা নামে একটা গ্রামে। গ্রামটি ছিল টাঙ্গাইল শহরের উপকণ্ঠে টাঙ্গাইল থেকে ভাড়া ছিল মাত্র এক টাকা। তাই সবাই বলতো কি দাম? ও সমস্ত অঞ্চলের পুরুষ লোকেরা সর্বদা হেঁটেই চলাচল করত। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের কৃষকদের নিজস্ব গরুর গাড়ি আছে। তাদের মেয়ে-ছেলেরা গরুর গাড়িতে করে এদিক সেদিক যায়। আর বর্ষাকালে নৌকা ছাড়াতো উপায়ই নেই। ওদের খুব মজা লাগছিল। সকালে গাড়িতে উঠে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওরা পৌছে গেল। গিয়ে দেখা গেল যে শংকরের মা সকালের খাবার রেডি করে রেখেছে। ঘরে ভাজা মুড়ি-মুড়কী বাড়ির আম কাঁঠাল ও ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধ দিয়ে ওদের খেত দিল, সবাই একসঙ্গে বসে আনন্দ করে খেল। শংকরের বোন রত্না ও ভাই সূর্য সবাই বাড়িতে আগে এসে সব গোছগাছ করে রেখেছে।

সকালের খাওয়া খুব মজা করে হওয়ার পর, দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ব্যানার্জী গিন্নিতো মিত্র গিন্নির হাতে খাবে না। এখানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার আছে। মিত্র গিন্নি বলল, দিদি কোন অসুবিধা নেই সব ব্যবস্থাই আছে, বারান্দায় আপনার জন্য রেঁধে নিন। তাই হলো। বাড়ির রান্না শংকরদের রান্না ঘরেই হলো।

গ্রামের বাড়ি কি সুন্দর অবারিত মাঠ, অকৃত্রিম প্রাকৃতিক হাওয়া গ্রীষ্মের দিনে গাছে গাছে আম-কাঁঠাল ঝুলছে। কি মনোরম দৃশ্য। রতনদা নামে এক ব্যক্তি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, ভারী রসিক লোক ছিল। বলল, শংকরদা চল তোমার গৌরীকে নিয়ে একটু হেঁটে আসি, সেখানে দীপ্তি, ওর বোন, আমিও ছিলাম। দীপ্তি বলল, সাবধান মত কথা বলবি, আমিতো কিছুই বলিনি, তোর এত লাগল কেন? বলিস আর নাই বলিস। যা এখানে থেকে। পায়ে চলার পথ কি সুন্দর, বাড়িগুলো উঁচু উঁচু রাস্তা নিচুতে, মনে হচ্ছে যেন পাহাড় বেয়ে একবার উপরে উঠছে আবার নামছে। হাঁটতে হাঁটতে খানিক পরে দেখা গেল, শুধু মহামায়া ও জয়ন্তী হাঁটছে, ওরা দুজন নেই। জয়ন্তী বলল, এই মায়া যদি আমরা হারিয়ে যাই, পথ খুঁজে না পাই, জঙ্গলের মধ্যে....বলেই কেঁদে ফেলল।

ও মা গো বলেই চিৎকার দিয়ে উঠল। মহামায়া বলল, তুই রাস্তা না চিনিস আমি তো চিনি। চল চল পা চালিয়ে হাঁট বলেই হ্যাচকা টান দিয়ে জয়ন্তীকে নিয়ে যেতে লাগল। তখনই রতনদা এসে পড়ল, বলল, বলেছিলাম ঠিক হলো তো? মহামায়া বলল, ওরা ঐ যে ঐ ঝোঁপে এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে চল আমরা বাড়ি যাই। বোকা মেয়ে,চল, চল বলে ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ওখানে ওরা তিনদিন ছিলো। তার মধ্যে একদিন ঝড়বৃষ্টি হলো। ঝড়ের মধ্যে আগে শংকর লাফ দিয়ে আম কুড়োতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি, জয়ন্তী ও মহামায়াও দৌড়ালো, ওদের মা তো পিছনে ধাওয়া করে ওদের ক্ষান্ত করতে চাইল কিন্তু তাই কি হয়, এ স্বাদ তো ওরা কোনদিনও পায়নি। ঝড়ে আম কুড়ানো, ঝমঝম বৃষ্টিতে ভেজা এগুলোতে আনন্দই আলাদা। কীসের ধমক, কীসের বকা, সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে ওরা মনের আনন্দে ভিজে বারান্দায় উঠল। দীপ্তির মা বলল, থাক ওখানে, আমি তোদের দেখবো না, মহামায়া গামছা নিয়ে এসে জয়ন্তীকে মুছে দিল। যে চুল জয়ন্তীর মাথায়, জয়ন্তী কেন দু বোনেরই। কালো কুচকুচে থাক থাক মোটা গোছা মোছাও মুশকিল।

মহামায়া বার্তা গিয়ে বুঝতে পেরেছে, শংকর আর দীপ্তির মধ্যে একটা কিছু চলছে। দীপ্তিও ঠিক তেমন করে কিছু বুঝতে না পারলেও কিশোরী বয়সে একটা রোমান্স, দেহে একটা শিহরণ অনুভূত হচ্ছে। এ পুলক, এ শিহরণ এর অর্থ দীপ্তি তখনও বুঝতে পারেনি, এরপরেই ওরা টাঙ্গাইল এসেছে। এর কয়েকদিন পরেই শংকরের পরীক্ষার ফল বেরুল। শংকর অংক ও সংস্কৃতে লেটার পেয়ে ১ম বিভাগে পাশ করেছে। এটা ওদের বাড়ির ও স্কুলের কেউ আশা করেনি। শুধু আশা করেছিল অপু। কারণ এই ফলে অপুরও অনেক শ্রম ও আশা ছিল। শংকর রেজাল্ট পেয়েই টিচারদের কিছু না বলে এক দৌড়ে অপুর কাছে এসে তাকে প্রণাম করে বলল, মা তোমার মান রাখতে পেরেছি তো? তুমি খুশি হয়েছে তো? মা তো খুশিতে আটখানা। খুশি হবো না মানে? আমার ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, বলে বুড়ো ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। শংকর মহাখুশীতে বাড়ি চলে গেল। দীপ্তি এসে বলল, ছোট পিসী তোমার ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করল, আমাদের কিছু খাওয়াবে না?

-কি বলিস। অবশ্যই খাওয়াবো। দাঁত টাত ভাল করে মেজে রেডি হয়ে থাক।

- ছোটপিসী ভাল হবে না, কিন্তু ওগুলো কি কথা নইলে আমি খাবই না।

-যা, সব হবে, সন্ধ্যারাত্তির পরে।

শংকরের কাকা টাঙ্গাইলের বড় একজন ব্যবসায়ী সুধাংশু মিত্র তার নাম। শংকর চাচ্ছে কলেজে পড়বে এবং পরবর্তীকালে আরও ভাল রেজাল্ট করতে কিন্তু ওর কাকা চায় শংকর উনার ব্যবসায় কাকাকে সহযোগিতা করুক। এটা কিছুতেই শংকরের মনমত হয় নি। তাই সে অপু মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়েছে। অপু বলল, ঠিকই তো এত ভাল রেজাল্ট করে দোকানদারী করবে। শোন কাকার কাছে কান্না কাটি করে বল, আমি পড়বই, টিউশনি করবো, দেখ এতে তোর কাকার মন গলে কিনা। তারপরে তো আমি আছিই। মা'তো সর্বদাই ছেলের মঙ্গল চায়। শংকর কাকার হাতে পায়ে ধরে সত্যিই রাজী করিয়েছে। তাতে কাকা বলেছে আমি কিন্তু একটা পয়সাও তোমাকে দিবো না, শুধু ভিক্ষা না করে যেমন খুশি কর। এ কথায় অপুও খুশি হয়েছে, কারণ ওর কাকা অত নিষ্ঠুর নয়। উনি এক ব্যবস্থা না হয় আরেক ব্যবস্থা করবেই তাছাড়া অপুতো আছেই। অপরূপা শংকরের কাকার ছেলে-মেয়েদের পড়ায়। সেজন্য মাঝে মাঝে সুধাংশু বাবু অপুর কাছ থেকে সন্তানদের লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করে। অপরূপা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, শংকর সম্বন্ধেও একদিন আলোচনা তুলে সুধাংশু বাবুর মনোভাব বুঝবে। শংকর করটিয়া সা'দৎ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

দীপ্তি অপরূপ সুন্দরী, লেখাপড়ায় ভাল, ভাল গান গায়। দীপ্তি ম্যাট্রিক পাশ করে কুমুদিনী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলো এবং পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্য হোস্টেলে সিট নিয়ে হোস্টেলেই থাকত। তখন ছাত্রীদের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল। আজকাল তার ছিটেফোটাও পাওয়া যাবে না। আজকাল ব্যস্ততার জন্য শংকর ও দীপ্তির সঙ্গে খুব কম দেখা হয়। শংকর খুবই সিরিয়াস। লেখাপড়ার বাইরে কিছুই বুঝে না। এই জন্য দীপ্তির খুব রাগ তুমি কেন প্রতিদিন আমার সাথে দেখা কর না। এটাই দীপ্তির আকাঙ্ক্ষা, শংকরও কম যায় না। প্রতিদিন কি করে দেখা করব? তুমিতো এখানে থাকই না, প্রতি শুক্রবারও আসো না। তাহলে? তোমার হোস্টেলে যাওয়ার কি দরকার ছিল? আমি কলেজ থেকে এসে, পরীক্ষা দিয়ে এসে উনাকে পাবো না, কি দরকার আমার। আমি এইতো চলে যাচ্ছি ঢাকা, আর আসবো না।- আমার বয়েই গেছে বলে হাসতে হাসতে দীপ্তি চলে গেল। - এই দীপু, দীপু শুনে যাও, কথা আছে। আর কার কথা কে শোনে।

শংকর বিএ-তেও ভাল রেজাল্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। হলেই থাকে। বেশি আসে না। কাকা ওকে এম.এ. পড়তে বারণ করেছিল কি করে মানবে সে কথা। ওর মাথায় লেখাপড়ার বীজ ঢুকেছে। এমএতে ভাল রেজাল্ট করেছে, এখন শংকর ভাল চাকরির আশায় দিন গুনছে। সব কপালে কি সব ভাল হয়। দীপ্তি কুমুদিনীতেই বি.এ. পড়ছে। ভাল ভাল বিয়ে আসছে দীপ্তির, কিন্তু দীপ্তির এক কথা পড়া শেষ না করে কোন বিয়ে হবে না। মা-বাবা ভাল পাত্রগুলো ছেড়ে দিচ্ছে আর বকছে, মেয়েটার কপালে যে কি আছে? একজন ভাল পাত্রী যাতে হাতছাড়া না হয় সেজন্য ভাল চাকরি খুঁজছে। আর একজন ভাল পাত্র যাতে হাতছাড়া না হয় সেজন্য পড়ার ছুঁতো খুঁজছে। এইভাবে প্রেমিকপ্রেমিকার বিরহে মিলনে দিনগুলো কাটাচ্ছিল। দীপ্তি বি.এ. বি.এড পাশ করে মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোমসে শিক্ষিকার পদে চাকরি নিল। ভাল চাকরি পাচ্ছে না বলে শংকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝেই হোম্‌সে যায়। দীপ্তি হোস্টেল থেকে বের হয়ে শংকরের সঙ্গে ঘুরতে যায়।

দীপ্তির ছোট বোন জয়ন্তীর রূপ দেখে ও গান শুনে এক যুবক ধনী ব্যবসায়ী একবারেই বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আর বড় মেয়ে লেখাপড়া শেষ না

করে বিয়ে করবে না। এত ভাল পাত্র হাত ছাড়া না করাই ভাল। ছোটকে ধনী ব্যবসায়ী যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিল।
দীপ্তি অপেক্ষা করছে শংকরের ভাল চাকরির। কিন্তু মা-বাবা তো মানছে না। এ কথা নিজ মুখে কি করে বলে। ছোটপিসী অপরূপা এখানে থাকলে উনাকে দিয়েই সব করানো যেত কিন্তু বছর খানেক হয় তারও বিয়ে হয়ে সে লন্ডন গিয়ে ঘর সংসার করছে। শেষ পর্যন্ত দীপ্তিকেই তার কৃতকর্মের কথা বলতে হলো। পড়ন্ত বিকেলে হোমসের দক্ষিণে নদীর পশ্চিমে মাকে নিয়ে বসে দীপ্তি মাকে যতখানি বলতে পারে তাই সে অকপটে বলল, মাতো শুনেই রেগে উঠে বলল, মা এ তুই কি বলছিস, কিছুতেই তা হবে না। আমার মেয়ে বিয়ে হবে কায়স্থের সাথে? সে কিছুতেই হবে না।
- মা হতেই হবে, আমি শংকরকে কথা দিয়েছি, এ কথার নড়চড় কিছুতেই হতে দিবো না।
মা রাগে গড়গড় করতে করতে বলল, আমারই ভুল হয়েছে, ভাল ছেলে ভেবে বিশ্বাস করেছিলাম। তাই সরল বিশ্বাসে মিশতে দিয়েছিলাম। তার এই পরিণতি। মা ভীষণ জেদী ও রাগী, বলল, তুই যদি আমাদের পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে না করিস, তবে আমরা এ দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে তোর ঠাকুরদার ওখানে থাকবো। আস্তে আস্তে রঙীন গোধূলির রং বদলাতে বদলাতে রাতের অন্ধকারের কালো রং এসে নদীর তীরে ছড়িয়ে পড়ল। মা আর মেয়ে দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।
পরের দিন রবিবার, শংকর সন্ধ্যায় এসেছে তার দীপুর সঙ্গে একান্তে কিছু বলতে। সবার অলক্ষ্যে প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে শংকরের খুব ভাল লাগে। দীপ্তি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে, সহজে তার পেটের কথা বের হয় না। ধমকেও নয়, আদরেও নয়। দীপ্তির মুখ দেখেই শংকর বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে। অনেক বুঝানোর পর শেষ পর্যন্ত কেঁদে দিয়ে বলল, মা রাজী নয়। তাহলে তুমিই বল, আমি কি করব?
- তুমি আবার কি করবে, কিছু করবে না। আমার কাছে থাকবে।
শংকর আর দীপ্তি মাঝে-মাঝেই এই ভারতেশ্বরী হোমসের ভিতরে যে ঘাটলাওয়ালা পুকুর আছে। সেই ঘাটে একে অপরের অতি সংলগ্ন হয়ে বসে তারা প্রেমালাপন করে। সেদিন দীপ্তিকে কোলের কাছে বসিয়ে শংকর তার নিজের মুখ দিয়ে দীপ্তির মুখ ঢেকে নিয়ে বলল, তুমি চিন্তা করো না আমার মাকে বলব মা যদি চায় তার বেকার ছেলে বিয়ে করুক, তাহলে আমি তাই করব, দীপ্তি এক ঝটকায় মুখ তুলে নিয়ে বলল, তুমি সত্যি তাই করবে?
-হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই করব।
- চল, তাহ'লে কালই মার কাছে যাই।
- যাই বললেই তো হয় না, কালতো ছুটির দিন নয়। ছুটি আসুক তারপর হবে। তোমার সব ইচ্ছে আমি পূরণ করবই। আমার দীপুর চোখের জল আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। যে দীপুকে আমি এত ভালোবাসি, সেই দীপু কি আমার জন্য দু' চারদিন অপেক্ষা করবে না? তোমার শংকরকে কি দুঃখ দিতে চাও?
- তোমাকে আমিও এত ভালোবাসি বলে দুঃখ দিতে চাই না কখনও।
তিন মাস পর দীপ্তির কাছে এসে বিদায় নিয়ে চিরতরে দীপ্তির মা-বাবা ইন্ডিয়া চলে গেল। এ নিদারুণ দুঃখও বুকে চেপে শংকরের মুখ চেয়ে সহ্য করে নিয়েছে। শংকর ও দীপ্তি আজও ঘাটলায় বসে আলাপরত। শংকর লক্ষ্য করেছে মা-বাবা চলে যাওয়ার পর দীপ্তির ব্যবহার কেমন যেন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে।
শংকর মাঝেমাঝেই দীপ্তির সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কিছুতেই দীপ্তির মন ভরে না। দীপ্তি শংকরকে জোর দিয়ে বলল, তুমি যদি আমাকে অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে না কর তাহলে তোমার আর কিচ্ছু করতে হবে না।
শংকর দীপ্তির হাত দুটি ধরে বলল, দীপ্তি তুমি একি বলছ, তুমি কি পাগল হলে?
- আমার কিছুই হইনি। আমি শুধু তোমাকে চাই, তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। তোমার জন্য আমার মা-বাবাকে হারিয়েছি আমি সেটাও সহ্য করেছি শুধু তোমার জন্য।
আশ্চর্য হয়ে শংকর বলল, আমার জন্য, দোষ আমার-তোমার কাছে আমি এমন আশা করিনি যদি সবকিছুতেই আমার দোষ হয়ে থাকে, তবে আমি থেকে লাভ কি? আর আমার ভালোবাসার বা কি দরকার।
ততোধিক রাগে দীপ্তি বলে উঠল, কি এতবড় কথা। আজ কেন সে কথা বলছ? আমার মনপ্রাণ দিয়ে হৃদয় উজাড় করে যাকে এত ভালোবাসলাম। সেই ছোট্ট বেলা থেকে যাকে একান্ত আপন ভাবলাম, তার মুখে এমন কথা শোনার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল। কেউ যেন থামতে চায় না। শংকরের এত রাগ কেউ কোনদিন দেখেনি। অত্যধিক রাগে শংকর হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। শংকর বলল, ঠিক আছে তুমি যা খুশি কর। আমি চললাম, আর কোনদিনও তোমার কাছে আসবো না বলে দীপ্তির দেওয়া আংটি পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। ওর ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য হয়ে ওখানেই পুকুরের দিকে যেখানে আংটিটা ফেলে দিয়েছে তার দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে হোমসে তার ঘরের দিকে চলে গেল।
শংকরের নিজের ব্যবহারের জন্য মনটা খুব খারাপ। এত মনমালিন্য এত ঝগড়া, এত রাগ-অভিমান সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে আজ শংকরের মনটা খুবই উৎফুল্ল। কারণ শংকরের চাকরিতে যোগদানের চিঠি এসেছে, চিঠিটা দেখেই শংকর খুশি কারণ এটাতে যোগদান করা যায় এ.এস.পি পদে। চিঠিখানা পড়েই শংকরের দু'চোখে ভেসে উঠল দীপ্তির মুখচ্ছবি। ভাবলো এখনই দৌড়ে গিয়ে আমার শ্রেষ্ঠ প্রিয়জন দীপ্তিকে জানাই। সেই ঘটনার দু'দিন পর আজ বিকেলে বুকে অফুরন্ত আশা ও আনন্দ নিয়ে শংকর মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী স্কুলের গেটে দাঁড়াল। সবাই এ সুশ্রী নায়ককে চেনে। উনাকে বসতে দিয়ে ভিতরে খবর দেওয়া হলো। শংকরের কাছে এক অদ্ভুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত খবর এসে পৌঁছাল। যার জন্য শংকর প্রস্তুত ছিল না।

এক শিক্ষিকা এসে বলল, দিদি তো নেই। ব্যস্ত হয়ে শংকর বলল, নেই তো কোথায় গেছে?
মহিলা বলল, উনি পদত্যাগ করে কোথায় গেছে, তা জানি না। উনি পরশুদিন চলে গেছে। শংকর চেয়ারে বসেই অস্বস্তি অনুভব করছে। আর দরদর করে ঘামছে। অসুস্থ অবস্থাতেও শংকর উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু দারোয়ান ওকে এসে ঘরে নিয়ে ফ্যান ছেড়ে বসতে দিল। তারপর সুস্থ হয়েই শংকর চলে গেল।
তখন থেকেই শুরু হয়েছে দীপ্তিকে খোঁজা। আজ থেকে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দীপ্তিকে শংকর খুঁজেই চলেছে। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে ভেবে নিয়েছে ওকে আর পাবো না, ‘ও’ হয়তো ইন্ডিয়াতে মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছে। লোক দিয়ে খোঁজ নিয়েছে, সেখানেও যায় নি। শংকরের প্রশ্ন তা হলে গেল কোথায়? আবার ভাবে যাবে কোথায়, ওকে আমি তো আমার হৃদয়ে আজন্ম বেঁধে রেখেছি ওর তো কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। পাগলের মত মাঝে মাঝেই প্রলাপ বকতে থাকে।
শংকর তার কর্মক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। সেখানে কাজের মধ্যে থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, ওকে ওর কাছের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারী সর্বদা খেয়ালে রাখে, রাখলে কি হবে। কি করে ওর দীপুকে ভুলে থাকবে, সে কি ভুলা যায়। তবুও কাজের মধ্যে থাকলে কিছুটা ভুলা যায়। শংকর মনে মনে ভাবল, কতদিন হয় ময়মনসিংহ এসেছি কিন্তু লোকনাথ বাবার আশ্রমে যাওয়া হয়নি। একদিন সময় করে বাবার দর্শন লাভ করে আসবো।
সেই রাতে দীপ্তি মার্কেট হাউজের রুমটায় খুঁজে খুঁজে দারোয়ানের পোষাক পেয়ে সেটা পরে নিজের ব্যাগ থেকে কাপড় নিয়ে অন্য আর একটি ব্যাগে ভরে ভোর রাতে পা টিপে টিপে সার্কিট হাউস থেকে সবার অজান্তে বের হয়ে গেল। বাইরে এসে দেখে এখনও অন্ধকার দূর হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে গাঙের পারে গেল। দেখে কি স্বচ্ছ জল, হাত দিয়ে দেখল আহা কি শীতল, সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়িয়ে যায়। কাপড় কোমরে বেঁধে যখনই ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপ দিবে তখনই পিছন থেকে পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠল দাঁড়াও কি করতে যাচ্ছ-এ কথা বলেই সে দীপ্তিকে ধরে নদীর পারে নিয়ে এলো এবং মাথা হাতিয়ে আদর করে বলল, কি করতে যাচ্ছ মা?
বৃদ্ধটি লোকনাথ বাবার আশ্রমের পুরোহিত। প্রতিদিন ভোরবেলায় স্নান সেরে ফুল তুলে পূজার আয়োজন করে। সেদিন একটু আগেই ঘুম ভেঙেছিল এবং দেরী না করেই নদীতে এসেছিল। এসেই দেখে এই কাণ্ড। দীপ্তিকে পুরোহিত মশাই এক প্রকার জোর করেই তার মন্দিরে নিয়ে আসল।
- মা তোমার নাম কি?
- নাম, দীপ্তি ব্যানার্জী
- তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে?
পুরোহিত দেবাশিস চক্রবর্তী দীপ্তির সমস্ত খবরাখবর নিল। দীপ্তিকে পুরোহিত বলল, মা আজকে বাল্য ভোগের সমস্ত যোগাড় যন্ত্র তুমি করে দিবে। দীপ্তি রাজী হলো এবং সব ঠিকঠাক পূজার সরঞ্জাম প্রস্তুত করে এবং পূজা শেষ করে পাশের ঘরে চলে গেল। পুরোহিত পূজার প্রসাদ এনে বলল, মা তুমি খেয়ে নাও। আমি জানি তোমার উপর অনেক ধকল গিয়েছে। খেয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।
বাল্যভোগের পর পুরোহিত রাজভোগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় মন্দিরে এক ভদ্রলোক এসে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করেছে। পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবী। পুরোহিতকে ভোগের কথা বলাতে সে বলল, বাইরে পূজার সব কিছুই পাওয়া যায়, ওখান থেকে কিনে আনুন। ভদ্রলোক কিনে এনে লোকনাথ বাবার সামনে ধপ করে বসে পড়ল। পুরোহিত কাছে গিয়ে বলল, বাবা আপনার কি শরীর খারাপ? দুঃখভারাক্রান্ত মনে সে বলল, শরীরের আর কি দোষ? মনই ঠিক করতে পারিনি। বাবা, আপনার সব অসুবিধার কথা অকপটে বাবার সামনে বলুন। আর বাবার কাছে প্রার্থনা করুন। আপনার প্রার্থনা যেন বাবা মঞ্জুর করেন। আপনার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়। ভদ্রলোক পুরোহিতের কথামত তাই করল এবং লোকনাথ বাবাকে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে প্রণাম করেন এবং পুরোহিতের হাতে টাকা দিয়ে উনাকে প্রণাম করে যাওয়ার উদ্যোগ করতে পুরোহিত বলল, প্রসাদ নিয়ে যান, আর রাজভোগ খেয়ে যাবেন। লোকটি বলল, আমার জীবনের সব কথাই তো আপনাকে খুলে বলেছি।
পুরোহিত বলল, সব শুনেই তো আমি আপনাকে থাকতে বলছি। মন্দিরের আরেকজনকে ডেকে বলল, দেখতো দেখি আজ বিয়ের তারিখ আছে নাকি? আর এগুলো সব গোপন রাখবে।
-আমি দীপু ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।
-ঠিক আছে আপনাকে দীপুর সঙ্গেই বিয়ে দিবো আপনি শুধু ধৈর্যই ধরুন।
- কি বলছেন? কই আমার দীপু?
- বিয়ের আয়োজন করতে ও সরঞ্জাম কিনতে যে কয়টা টাকা লাগে শুধু তাই দিবেন। পঞ্জিকা দেখে আমার সহকর্মী বলেছে, গোধূলি লগ্নে বিয়ে হবে। যান বাড়ি গিয়ে প্রস্তুতি নিন। কিছু খাবেন না যেন। শংকর অবাক হয়ে ভাবছে এটা কি রকম করে হয়। পুরোহিত কোথায় পাবে দীপুকে। তবুও না পাওয়ার মধ্যে কেউ যদি পাওয়ার আশ্বাস দেয় সেটাও ভাল লাগে। মনে হয় যদি তাই হ'তো। ভাবতে ভাবতে শংকর তার কোয়ার্টারে চলে গেল। বাবুর্চি রান্না করে রেখেছে, খেতে ডাকল, কিন্তু শংকর খেল না। একবার অফিস দিয়ে ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। পুরোহিত যদি ভুল করে তাহলে কি হবে। তবুও বুকে আশা বেঁধে চোখ বুঝে শুয়ে রইল। আর বারবার দীপুর মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমি কত বড় অপরাধী। প্রিয়জন যাকে ছেড়ে যায় তাঁর মত হতভাগা দুনিয়াতে আর নেই।
অনাড়ম্বর পরিবেশে আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধব বিহীন দীপ্তি ও শংকরের বিয়ে হচ্ছে ময়মনসিংহ লোকনাথ বাবার মন্দিরে। এর আগে কেউ কাউকে দেখেনি। বিয়ে অনেকখানি হয়ে এসেছে এখন শুভদৃষ্টি হবে। শংকর তো হা করে তাকিয়ে আছে দীপুকে দেখার জন্য, আর দীপু মুখ নিচু করে রেখেছে না দেখার জন্য, চোখ তুলে তাকালে যদি অন্য কাউকে দেখে তখন? সবাই বলে দীপ্তির ঘোমটা টেনে উঁচু করে

দিল যাতে মুখ দেখা যায়। পুরোহিত নিজেই হাত দিয়ে দীপুর মুখ উঁচু করে দিলো, তখন শংকর আসরের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে দীপু দীপু বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। আর দীপু মাথা নিচু করেই রইল। বিয়ের সব কাজ সম্পন্ন করে বর ও কনের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা শংকর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে করতে লাগল।

শংকর তার সহকর্মী পুলিশদের নিয়ে এলো, তাদের বলে সানাইপার্টি আনালো। নিজেদের গাড়ি ভর্তি পুলিশ বরযাত্রী নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে তার কোয়ার্টারের দিকে আস্তে আস্তে ঢুকছে। অন্যরা বাজনার বহর ও গাড়ির বহর দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আত্মদান

রুমা ইচ্ছা করেই গন্তব্যের বেশ কিছু আগেই রিকশা থেকে নেমে পড়ল। নেমেই কিছুটা দৌড়ের মত করে হাঁটতে লাগল। ওর দৌড়ানোর ভাব দেখে রাস্তায় এক ভদ্রলোক থমকে দাঁড়াল। লোকটার দাঁড়ানো দেখে রুমা হাত নেড়ে বলল, কিছু হয়নি। আপনি যান, বলেই সে আবার যেতে লাগল। তবে এবার আস্তে আস্তে হেঁটে গেটের সামনে এসে থামল। একি! ভদ্রলোকটি দু'হাত দিয়ে গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

রুমাকে দেখে ভদ্রলোক হাত সরিয়ে নিল, মৃদু হেসে রুমা কলিংবেল টিপতে গিয়ে দেখল নেমপ্লেটে মো. রফিকুল ইসলাম, আর দেখার ধৈর্য নেই রুমার। কলিংবেল টিপে দিল। সুন্দর একটা গানের সুর ভেসে এলো।

-গেটতো খোলাই আছে, আবার কলিংবেল কেন? চলে আসুন।

-যতই খোলা থাকুক না কেন, অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে ঢুকা যায়?

-হু... হ্যাঁ... তাতো বটেই। তবে কাকে চাই বন্ধু- না বান্ধবী?

- আপাতত বন্ধুকেই চাই।

- বন্ধু! তবে এসো প্রিয় সখি।

- ইয়ার্কি হচ্ছে? এই ম-নি-ম-নি

মনি ছুটে এসে প্রিয় বান্ধবী রুমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আসবি জানি, কিন্তু কবে আসবি তাতো জানাসনি, চল চল ভেতরে চল।

রফিক অবাক বিস্ময়ে দু'বান্ধবীর হাবভাব দেখছিল। চুপচাপ থাকতে না পেরে হাত নেড়ে জোরে জোরে বলতে লাগল- বারে আমি এতক্ষণ আমার বন্ধুকে কষ্ট করে এ পর্যন্ত আনলাম, আর এখন দুজনের কেউ আমাকে চিনতেই পারছে না একদম পাত্তাই দিচ্ছে না। বান্ধবীকে পেয়ে আমার প্রিয়তমা তো আমাকে এক্কেবারে ভুলে গেল। এ কেমন করে সম্ভব? দু'বান্ধবী হাতে হাতে ধরি ধরি করে হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ছোট একটা ছেলে রুমার হাত ধরে দাঁড়াল ওকে কোলে নিয়ে রুমা বলল ছেলে বুঝি?

-হ্যাঁ কোহিনূর, ওর বয়স ৭ বছর। তোকে আরও কারিশমা দেখাবো। আরও একজন আছে, তার নাম নীলা। ওদের বাবার দেওয়া নাম, বলতো কতদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। এতদিন তোর পথ চেয়ে থাকতে থাকতে তোর আশা ছেড়েই দিয়েছি।

আমার বিয়েতে আসিসনি। তখন তোর ছোটবোনের বিয়েতে ভারতে চলে গিয়েছিলি। তারপর আমার ছেলে কোহিনূর হলো তখনও তোর পাত্তা নেই। তুই অন্যত্র বদলি হয়েছিস, দূর! আমার ভাগ্যটাই খারাপ!

-এই ভাগ্য খারাপ কিসের রে? কার্তিকের মত সুদর্শন, বিদ্বান স্বামী, সুন্দর টুকটুকে দু'টো পুত্রকন্যা পেয়েছিস। তারপরও খারাপ কিসের? আর দেখতো আমাকে, আমার আগে পিছে কেউ নেই, শুধু মা আর ভাইটা।

মনি রুমাকে ধমক দিয়ে বলল,- তুই চুপ কর, এতরূপ, এত গুণ যার, সে কেন একাকী? ইচ্ছে করলেই অনেককিছু করতে পারিস। তোকে পাওয়ার জন্য কত লোক তাকিয়ে আছে। আর তুই কাউকে পাত্তাই দিচ্ছিস না।
- কি করে দিবো। যখন বয়স ছিল তখন সময় ছিল না। আর যখন সময় হলো তখন বয়স নেই। কাউকে ভালোবাসতে পারলাম না, কেউ আমাকে ভালবাসলো কিনা তাও জানতে পারলাম না। তারপরেও তোরই ভাগ্য খারাপ?
- ভাগ্য নিয়ে পরে আলোচনা হবে। কাপড়চোপড় কিছু এনেছিস?
-না আনিনি, আমি আজই চলে যাবো। জায়গাটা দেখতে এসেছি, কোয়ার্টার কেমন। কীভাবে সাজাবো। তোদের নয়নভরে দেখবো, আনন্দ পাবো। সব ঠিক করে ভাল দিন দেখে কাজে যোগ দিব।
- যেদিন কাজে যোগ দেবার দিবি। এখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আয়, চা খাবি। রুমা আজই চলে যাবে শুনে মনির অভিমান জড়িত রাগ হয়েছে। রুমাকে নিয়ে মনি চা খেতে বসল। ইচ্ছে করেই অধ্যাপক স্বামীকে ডাকেনি, কারণ তার প্রতিক্রিয়া দেখবে এবং বান্ধবীকে দেখাবে। রুমা ডাকল, আসুন। অধ্যাপক সাহেব অংশগ্রহণ করুন।
-না---না---না আমি অপাঙক্তেয় হয়ে গেছি। আমি তবে যাই, পরে না হয় আসবো।
হেসে দিয়ে মনি বলল, তাই যাও থাকলে ভাল দেখায় না, বলেই দৌড়ে স্বামীর হাত ধরে টানতে টানতে চেয়ারে বসল।
- দেখতে পাওনি, তোমার চেয়ারটা খালিই পড়ে আছে। বসো ভদ্রলোকের মত।
-ও--- তাইতো, আমিতো দেখতেই পাইনি। আমার প্রিয়তমা এত বিচক্ষণ। ক্ষমা করো মোরে হে সুন্দরী।
কোহিনূর ও নীলা দু'জনেই মনি ও রুমার মাঝখানে ওদের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। তিন বছরের ছোট্ট টুকটুকে মেয়ে, ডাগর ডাগর চোখ দুটি, ভারী মিষ্টি। রুমাকে বলল, 'আন্টি তুমি কিন্তু যাবে না, বল যাবে না!'
- না--- না--- আমি যাবো না। আমি তো জামালপুর থাকতে এসেছি। বল, তোমরা আমায় রাখবে?
নীলা আন্টিকে ছোট্ট নরম দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, হ্যাঁ রাখবো তো, কোনদিনও যেতে দিব না। মনির ছেলেমেয়ে দু'টি এমন মায়াবী যে প্রথম দিনই ওরা ওদের আন্টিকে আপন করে নিয়েছে। ওদের ছেড়ে যেতে রুমার খুব কষ্ট হচ্ছে।
রুমা টাঙ্গাইল এসে সবকিছু গুছিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে জামালপুর এসে কাজে যোগ দিল। অফিসে সে স্টাফদের সাথে পরিচিত হলো, সাথে কাজ বুঝে নিতে নিতে বেশ অনেকটা সময় গড়িয়ে গেল, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। এদিকে মনি তার সন্তানদের তাগাদায় থাকতে না পেরে রুমার অফিসে এসে হাজির হয়েছে। অফিসে ঢুকে দুজনেই আন্টি আন্টি বলতে বলতে রুমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোহিনূর আন্টির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এত দেরি করছ কেন? রাত হলো তো, তাড়াতাড়ি চল। --হ্যাঁ বাবু যাচ্ছি। এই মনি তুমি স্কুলে গেলেও কি ওরা এমনি করে?
- -- না-- না তখনতো এত হাহুতাশ করে না। চুপচাপ ভালই থাকে। কোহিনূর-নীলাকে আদর করে মিষ্টি খাইয়ে দিল। রুমার গাড়ি করে ওরা কোয়ার্টারে রওনা হলো।
রুমার বান্ধবী মেহেরুননেছা মনি। রুমা জামালপুর বদলি হয়ে আসছে শুনে মনি ভীষণ খুশি হয়েছে। মনি আর রুমা দুজনে একসঙ্গে টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজে পড়ত। সেই সুবাদে দু'জনে অন্তরঙ্গ বান্ধবী। আর তখন ঐ কলেজে বান্ধবী ও বোন পাতানোর একটা রেওয়াজ ছিল। যারা বান্ধবী কিংবা বোন কিছুই পাতাতে পারেনি তাদের মত হতভাগিনী আর নেই। মনি জামালপুরের মেয়ে। তখন মহিলা কলেজ খুব কম ছিল। কুমুদিনী কলেজে লেখাপড়ার খরচ খুব কম ছিল। খাওয়া থাকা এসব কিছু ফ্রি এবং কলেজের বেতনও নামমাত্র এবং কলেজ ও হোস্টেলের নিয়ম কানুন কঠোর ও সুশৃঙ্খল। এই সমস্ত সুবিধার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মেয়েরা এসে এই কলেজে পড়ত।
রুমা ও মনি হোস্টেলে একই কক্ষে থাকত। তাই তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনও খুব শক্ত। মনি পরবর্তীকালে জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়। আর বান্ধবী রুমা জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে তরীখানা একদিন পালে বাতাস পেয়ে তরতর করে চলতে চলতে ওপার গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কূলে এসে ভিড়ল।
রুমার মা ও একটা ছোটভাই ছাড়া আর কেউ নেই বাংলাদেশে। এইতো দশবছর আগে বাবা গত হয়েছেন। রুমার মনে হয় এই তো সেদিনও সব ভাই-বোন বাবা-মা মিলে এদেশেই ছিলাম। এখন অন্য ভাই-বোনেরা ভারতে চাকরি করে, বিয়েটা করে সুখে সংসার করছে। রুমাদেরও নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু রুমা ভাল চাকরি পেয়েছে। স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করছে। মায়ের অকৃত্রিম আদর যত্ন পাচ্ছে। মা আর ভাইয়ের ছোট সংসারে ওরা সুখেই আছে। যেমন করে মাকে ভুলা যায় না, ঠিক তেমনি জন্মভূমি টাঙ্গাইলকেও ভুলা যায় না। মায়ের টানে, জন্মভূমির টানে জামালপুর থেকে নান্দিনা, দিঘপাইত, ধনবাড়ী, মধুপুর, ঘাটাইল, কালিহাতী, এলেঙ্গা হয়ে টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ড নেমে যেন রুমা অপার শান্তি লাভ করে। সে মনে করে যেন দিগ্বিজয় করে এলো। বাড়ি পৌঁছে মাকে জড়িয়ে ধরে ভাবে কি শান্তি।
মা অভিমান করে বলে, এতদেরী করে এসে আবার আহ্লাদ দেখাচ্ছিস। আয় মা ঘরে আয়। মেয়ে মাকে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমিতো জানোই তোমার মেয়ে কাজ পাগল। প্রবাদ আছে না -" নাই কাজতো খই ভাজ" কাজ না থাকলে রুমা কাজ তৈরি করে নিতে জানে। মা, এবার একসপ্তাহ তোমার কাছে থাকবো। তিনদিন সরকারি ছুটি বাকী চারদিন ছুটি নিয়েছি, মাকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদে গদগদ হলো রুমা।

মা বলল- এখানে এসেও আমার কাছে কতক্ষণ থাকিস? সেই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা না করলে তোর কি ভাল লাগবে?

- সারাদিন যত হৈচই করি না কেন, রাতে তো আমার সোনা মাকে ছাড়া কারো কাছে থাকতেই পারি না। এখানে এসে মায়ের কাছ ছাড়া হবো, মায়ের হাতের রান্না খাবো না, তাই কি হয়! প্রয়োজনে দূরে থাকি বলে কি তোমার আদর যত্ন স্নেহকেও ভুলে থাকি? তোমাকে নিয়েই তো আমার পৃথিবী।

মা পড়ন্ত বেলায় পাটিসাপটা বানাচ্ছিল তার প্রিয় কন্যা রুমার জন্য। রুমা দুপুরে খেয়ে একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে মায়ের পিঠে হেলান দিয়ে বলল,'কি করছ মা, আমার প্রিয় পিঠা? একটু বেশি করে বানাবে, জামালপুর নিয়ে যাবো।'

- তাতো নিবেই, ছেলে-মেয়েদের না খাইয়ে মা কি শান্তি পাবে? আমি বেশি করেই গোলা গুলেছি। তোমার যত খুশি তত নিও। আমার মেয়ে যাতে খুশি হয়, শান্তি পায়, আমি তাই করব আমিতো মা।

মা মেয়ের কথা বলার সময় টেলিফোন বেজে উঠল- ক্রিং... ক্রিং.... ক্রি...।

মা মেয়েকে বলল, যা দেখতো কে?

- হ্যাঁ যাচ্ছি মা বলেই দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরল রুমা।

- হ্যালো--- ও ---- দুষ্টু নীলামনি--- হ্যাঁ--- হ্যাঁ--- কালই আসছি---- আচ্ছা--- আচ্ছা---- হু ---- হু---- বুঝেছি--- সব বুঝেছি।

রান্নাঘর থেকে মা বলে উঠল, আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আমি এবার জামালপুর গিয়ে মজা দেখাব। আমার এত ভাল মেয়েটাকে কি এমন যাদু করে পর করে দিল।

- যাদু টাদু নয় মা, তোমাকে কি করে বুঝাব, তুমি তো মা। তোমার না বুঝার কিছু নেই। ওরা ওদের ভালবাসা দিয়ে ওদের আন্টিকে জয় করে নিয়েছে।

পরেরদিন কাক ডাকা ভোরে রুমা জামালপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রথমে রুমা ভেবেছিল অফিসে জয়েন করে তারপর কোয়ার্টারে যাবে। পরক্ষণেই তার মত পাল্টিয়ে ফেলল। কারণ বাড়ি পৌঁছতে দেরী হলে কোহিনূর ও নীলা দু'জনেই পথ চেয়ে বসে থাকবে যত দেরী হবে ওরা কান্নাকাটি শুরু করে মা-বাবাকে অতিষ্ট করে তুলবে। তাই রুমা আগে বাড়ি এলো। রুমা রিক্সা থেকে নেমেই দেখল দু' ভাইবোন গেটের কাছে আন্টির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই শুভেচ্ছা স্বাগতম বলতে বলতে রিক্সার কাছে এগিয়ে গেল। রুমা রিক্সা থেকে নেমে দু'জনকে চুমু খেয়ে হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে এলো।

যতদিন যাচ্ছে কোহিনূর আর নীলা আন্টির বেশি ন্যাওটা হচ্ছে। মার্কেটিং করতে যাবে, কোন সহকর্মীর বাড়ি বেড়াতে যাবে কিংবা নিমন্ত্রণ খেতে যাবে সবখানে আন্টির সঙ্গে দুজনের যেতেই হবে। এক্সিবিশন হচ্ছে, ওখানেও ওদের আন্টির সঙ্গেই যেতে হবে। রুমা বলল, - তোরা তোদের মায়ের সঙ্গে যা, তোদের মা তো শিক্ষকদের সঙ্গে যাচ্ছে। একটু হেসে আবার বলল,-ও বুঝেছি, আমার কাছে গাড়ি আছে, তাই আমার সঙ্গে যাবে। আমি আজ গাড়ি নেব না। রিক্সা নিয়ে যাবো। কোহিনূর রুমাকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে বলল,

- তুমি রিক্সা নিয়ে যাও বা হাতি নিয়ে যাও। আমরা তোমার সাথেই যাবো, অন্যকারও সাথে যাবো না--- যাবো না--- যাবো না।

আন্টির কাছে যাদের এত আবদার, তাদের ফেলে কি রুমা কোথাও যেতে পারে? রুমা দুজনকে দু'হাত দিয়ে ধরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিয়ে সাজিয়ে দিয়ে নিজেও একটু পরিপাটি হয়ে নিল। ওখানে গিয়ে রুমা গার্লস স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মিশে গেল। ওরা সবাই একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছে। রুমা কোহিনূরকে শিশুদের উপযোগী বই কিনে দিল কয়েক খানা আর নীলাকে নানারকমের ছড়া ও ছবির বই, চুলের ব্যান্ড ও চুড়ি কিনে দিল। মনি কোহিনূরের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ভাল হয়েছে আমার আলসে ছেলেটা বই পেয়ে এখন যদি অলসতা ভেঙ্গে বইগুলো পড়ার অভ্যাস করে। তবেই না আন্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

দেখতে দেখতে জামালপুরে রুমার চার বছর কেটে গেল। রুমা মনির পরিবারের একজন পাকাপোক্ত সদস্য হয়ে গেল। মনি সংসারের যে কোন কাজ করতে রুমার পরামর্শ নিয়ে করে, ওকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব গুরুত্ব দেয়। মনি আর রুমার কোয়ার্টার পাশাপাশি। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাতায়াতে কোন অসুবিধা হয় না। কিছুদিন যাবৎ মনির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে আর অস্থির অস্থির লাগে। অধ্যাপক সাহেব খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রুমা আর রফিক দু'জনেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ডাক্তার দেখাল। ডাক্তার মনিকে খুব ভাল করে দেখে বলল,- তেমন কিছু হয়নি। প্রেসারটা একটু বাড়া। ওতে চিন্তার কিছু নেই। নিয়ম মত চললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মায়ের অসুস্থতার জন্য বাচ্চাগুলোও যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কি করে মনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে এটাই সবার লক্ষ্য। মনি জোর করেই কাজ করতে যায়। না করলেও শুনে না বরং বলে, আমার তেমন কিছু হয়নি। নিয়মিত ওষুধ খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তো স্ত্রী অন্তপ্রাণ। প্রিয়তমার এহেন অসুখে সে খুবই মুষড়ে পড়েছে। এ অবস্থায় রুমা কেমন করে এতসব ঝামেলা সামলাবে। রুমার মত মেয়েরা অন্য কারও অসুবিধা, কষ্ট দেখলে চুপ করে থাকতে পারে না। আর সেটা যদি প্রিয়জনের হয়। তাহলে তো মন প্রাণ উজাড় করে অন্যের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কি করে মানুষের কষ্টের ও দুঃখের সমাধান করা যায়। রুমা ওর সাধ্যমত পরিশ্রম করে, আদরে যত্নে মনিকে সুস্থ করে তুলল। ওদের সংসারে আবার হাসি ফিরে এলো। সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রহিমা বেগম। মায়ের মত ব্যবহার, খুবই ভাল মহিলা। রুমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। কারণ প্রধান শিক্ষিকাও টাঙ্গাইলের মেয়ে এবং কুমুদিনীর ছাত্রী। রুমা উনাকে বড় আপা বলে ডাকে। রুমা প্রায়ই স্কুলে ও প্রধান শিক্ষিকার কোয়ার্টারে যায়। স্কুলের অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গেও রুমার ভাব হয়ে যায়। মনোয়ারা আপা, হিমানী আপা, ঊষাদি, পারুলদি, ভারতী চৌধুরী, হোটেলের সুপার, রোকেয়া আপা, হেনা আপা, নূরুননাহার বকুল, সাহেরা বকুল, বিলকিস, সাজেদা, মনসুরা প্রায় সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাব গড়ে উঠে। রুমা আসলে খুবই মিশুক মেয়ে। ছোটবড় সবার সঙ্গে মিশতে পারে।

রুমা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, অকূল পাথারে পড়ে সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। বাচ্চাদের বাবাকেই মানাতে পারছে না, উপরন্তু বাচ্চা। রুমা যখন কিছুতেই কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। তখন তার বড় আপার মুখটা মনে পড়ল। আর তখনই বড় আপার কোয়ার্টারের দিকে ছুটল রুমা। সবটা শুনে বড় আপা বুঝতে পারল, মনির পরিবারের সঙ্গে রুমা কতখানি একাত্ম হয়ে গিয়েছে। বড় আপা বুঝতে পেরেছিল যে রুমা সেনকে আটকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ ওর মধ্যে মাতৃত্ববোধ এত বেশি যেটা দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বড় আপার জীবনেও নাকি এমন হয়েছিল। বড় আপার স্বামী প্রফেসর সাহেবেরও দুই বিয়ে এবং বড় আপা কচি-বাচ্চাদের মুখের দিকে চেয়ে মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। তিনিও সেদিন তার স্বামী প্রফেসর সাহেবকে না করতে পারেননি। কিন্তু এখানে আরেকটা অসুবিধা আছে সেটা হলো ধর্ম, রুমা যে হিন্দু। রুমার মা ও ভাই কী রাজী হবে? চেষ্টা করে দেখা যাক, বড় আপা ভাবল।

মায়ের অদর্শনে কোহিনূর ও নীলা সারা বাড়ি ঘুরে মাকে খুঁজে আর কান্নাকাটি করে, কোথায় গেলে মাকে পাবে। আন্টিকে বলে, মাকে এনে দাও, স্কুলে যাও, স্কুল থেকে মাকে নিয়ে এসো। কোহিনূরের বয়স ১২ বছর। সে বুঝতে পারে মায়ের মৃত্যু। তাই সর্বদা মনমরা হয়ে থাকে। নীলা এসে বলে, তুমি না বলেছ, মা আকাশের তারা হয়ে গেছে, কোন তারাটা এনে দাও না গো। বলেই কাঁদতে থাকে। কোহিনূর এসে বলে,

- আন্টি তুমি আমার মা হবে? আমাদের বাড়ি চলো। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না। একথা বলেই আন্টির শাড়ির আঁচল ধরে টানতে টানতে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে রুমাও কাঁদতে থাকে। হঠাৎ করে কাউকে কিছু না বলে চিকিৎসাটুকু করার সুযোগ না দিয়ে মনি যে এমন করে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে যাবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। এজন্যই কি রুমা জামালপুর আসাতে মনি খুশি হয়েছিল? রুমা ভাবছে, আমাকে একি মাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে রেখে গেলি? এ বন্ধন আমি ছাড়তেও পারছি না। বন্দি হতেও পারছি না। যেটা করলে আমাদের সবার ভাল হয় সেটাই করে দে, মনি আমি আর পারছি না। মনির ছেলেমেয়েদের প্রতি রুমার যে অগাধ মায়ামমতা সেটা রুমা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিল। রফিকুল ইসলামের নিদারুণ একাকিত্বও সে সহ্য করতে পারছিল না। রুমা কি করে বলবে মাকে এ কথা। কিন্তু কচি ছেলে-মেয়ে দুটির মুখের দিকে চেয়ে মাকে বলতেই হবে। রুমা অনেক কিছু ভেবে একদিন সকালে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

মা কিছুটা আগেই শুনেছিল, তবে আসল কথাটা কি তা বুঝতে পারেনি। কথায় আছে কুকথা বাতাসের আগে ছড়ায়। মা মেয়েকে কাছে বসিয়ে বলল, আমি তোর মা, আমার চেয়ে তোর ভাল কেউ বুঝবে না। যা বলবে ভেবেচিন্তে স্পষ্ট করে বল। মায়ের কথায় রুমা অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল,- মা আমার অপরাধ মার্জনা করো। আমার এটা ছাড়া আর উপায় নেই।

- গৌরবচন না করে আসল কথাটা বল।

এইটুকু বলতেই রুমা কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়েছে।

- মা, আমি কোহিনূর আর নীলার মা হতে চাই।

- কি বললে, তোমার বাপ-দাদার বংশে চুনকালি লেপে দিবে?

- মা, ওরা আমাকে মায়ের মত ভালোবাসে। আমিও মাতৃত্বের দাবী নিয়েই ওদের মা হতে চাই।

মা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল,- তোমার মত মেয়ে এতবড় ভুল করবে। এতো কখনো ভাবিনি। মা অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বলল- আমি এ বিয়েতে রাজী নই, আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পূর্বপুরুষদের কাছে কি জবাবদিহি করব?

রুমা মায়ের অনুমতি না পেয়ে কেঁদে কেটে রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরের দিন মাকে বলল- মা, আমি চললাম। মা কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের কাছে এসে বলল- এভাবে যাসনে মা, যা করিস, ভেবেচিন্তে করিস, মায়ের মুখটা মনে রাখিস। এ কথা বলেই মা আঁচলে মুখ ঢেকে দৌড়ে ঘরে চলে গেল। মা কিছুতেই ভেবে পায় না চল্লিশ বছর বয়সে মেয়ে কেন বিয়ে পাগল হয়ে উঠল। এই বয়সে যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তা বাধা দিয়ে নিবৃত্ত করা যাবে না।

জামালপুরে এসে নিজের কোয়ার্টারে না উঠে, প্রথমেই অধ্যাপক রফিকুলের পড়ার ঘরে গিয়ে উঠল। রুমাকে এভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে অধ্যাপক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

আমি যথেষ্ঠ ভাল আছি, এখন যা বলছি, তা মন দিয়ে শুনুন। আমি কোহিনূর ও নীলার মা হতে চাই। আমার অজান্তেই মাতৃহারা ছেলেমেয়েদের মা হয়েছি আমি, ওরাও আমাকে মাতৃত্বের স্থানটুকু অকপটে অর্পণ করেছে। এখন শুধু আপনার অনুমতির প্রয়োজন। এমন রুক্ষভাবে রুমাকে কখনো কথা বলতে দেখেনি রফিক। এ কোন মূর্তি!

- ছেলেময়েরা আমার বাড়ি ছেড়ে আপনার বাড়িতে ওদের মা হয়ে থাকতে বলেছে। ওরা হয়তো বা একদিন এ কথাটি আপনাকে বলবে।

- তুমি কি করে ভাবছো, মনির জায়গায় আমি অন্য কাউকে বসাতে পারবো! তা হবার নয়। এ জীবনে আমি মনির স্থানে অন্য কোন নারীকে বসাতে পারবো না।

রুমা চিৎকার করে বলল, যদি আপনি পুরুষ ও বাবা হয়ে থাকেন এবং আপনার পিতৃত্ববোধ থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই রাজী হবেন। এ কথা বলেই রুমা হনহন করে তার বাড়িতে চলে গেল।

কোয়ার্টারে এসে রুমা বিছানায় পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রুমা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। একদিকে মা ও রফিকুল, আর অন্যদিকে বাচ্চা দুটো। রুমা কিছুই ঠিক করতে না পেরে কাপড়-চোপড় গোছাতে লাগল। না... না... এভাবে.... হবে.... না..... কি.... করি..... কি...... করি...... আমি.......। আবার ভাবল অফিসে যেয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিবে। তালা চাবি হাতে নিয়ে দরজায় লাগাতে

যাচ্ছে এমন সময় কোহিনূর ও নীলা এসে হাত থেকে চাবির গোছা নিয়ে কোহিনূর বলল- কোথায় যাচ্ছ আন্টি... তুমি তো শুধু আমাদের আন্টি নও। আমাদের মা। ... মা .. মা বলেই রুমার বুকে মাথা রেখে হুহু করে কাঁদতে লাগল। রুমা নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। নীলা বলল, ভাইয়াতো বলল, তুমি আমাদের মা... ওমা তবুও তুমি চলে যাবে!

- নারে মা যাবো না, অফিসে যাবো তো! মনে মনে রুমা ভাবছে আর কাঁদছে মনি তুই আমাকে একি মহাসংকটে রেখে গেলি? একটু পরেই রুমা বড় আপার সঙ্গে দেখা করতে স্কুলে গেল। বড় আপার কাছে বিস্তারিত খুলে বলল। বড় আপা ওকে বুঝিয়ে বলল তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আজ না হোক কাল ওকে রাজী হতেই হবে ওর সন্তানদের মুখ চেয়ে। তুমি এত ভাববে না সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় আপার কথা বিশ্বাস কর।

রুমার দিকে তাকিয়ে বড় আপা বলল- মুখখানা এত শুকনো লাগছে কেন? সারাক্ষণ না খেয়ে শুধু কান্নাকাটি করেছ। দপ্তরি নেওয়াজ আলীকে খাবার আনার জন্য বলল। এক মাসের মধ্যে রুমা অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বাড়ি যায়নি ছেলে-মেয়ে দুটি রুমার বাড়ি এসেছে। থেকেছে এবং তাদের আদর যত্নের এতটুকুও ত্রুটি হয়নি।

একদিন গোধূলি বেলায় ওদের কোয়ার্টারের গেটের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় আলো আঁধারিতে রফিক দেখতে পেল, রুমা বাড়ি ফিরছে। রুমাকে দেখে আনন্দ বিহ্বলতায় ভরে যায় প্রেমিকের হৃদয়। মনে হয় যেন ভালোবাসার মানুষটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আজকে তার ছোঁয়া পেয়েছে। কাছে গিয়ে ডেকে বলল, রুমা তুমিই ঠিক। রফিক স্বস্নেহে আদরে ওর সুন্দর কোমল হাত দুটি ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে গেল রুমাকে।

মা, আত্মীয় স্বজন সবার অমতে রফিক ও রুমার বিয়ে হয়ে গেল। অনাড়ম্বর পরিবেশে শুধু রফিকের বন্ধু-বান্ধব, মনির বাপের বাড়ির লোক ও বড় আপা এবং যাদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বিয়েটা সম্ভব হয়েছে তারা হলো অতি আদরের কোহিনূর ও নীলা। বাড়ি ফিরে রফিক একখানা খাম রুমার হাতে দিল। খামের উপরে ঠিকানায় মায়ের হাতে লেখা দেখে রুমা বুঝতে পারল, এটা মায়ের চিঠি। চিঠির ভিতরে কি লেখা আছে সেটা ভেবে ভয়ে অস্থির হচ্ছে রুমা। ভাল কিছু হলে মা নিজে না এসে চিঠি দিল কেন? নিশ্চয়ই নেগেটিভ কিছু হবে।

- খোল, খোল, আমাকে দাও আমি খুলছি ব্যগ্র হয়ে বলল রফিক। রফিক চিঠিটা হাতে নিয়ে খুলে ফেলল। রুমা রফিককে চিঠিটা পড়তে বলল।

রফিক চিঠিটা যখন পড়ছে তখন রুমার মনে হচ্ছে মা যেন রুমাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর মাখা সুরে বলছে, মা, কাকে ভালবাসলে? কাকে বিয়ে করলে? আর কার সন্তানের মা হলে। কাকে, কীসের প্রতিদান দিলে? মা হওয়ার জন্য আর সন্তানের মুখে মা ডাক শোনার জন্যই কি এই আত্মদান? ভালো থেকো মা, সুখে থেকো, মায়ের প্রাণঢালা আশীর্বাদ নিও।